তর্ক, শাস্ত্রের নজির, ধর্ম্মের নজির সব জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিও,—তাহারাও পবিত্র হইবে।

এ পাপ জীবনে আর জন্মভূমি দর্শন করিব না, যাহার সম্মুখে দাঁড়াব, সেই আঙ্গুল দিয়া দেখাইবে—তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, মেজদিদি? যতদিন এ পাপ জীবন না যাইবে, ততদিন নারীর মহাতীর্থ স্থান শ্বশুরালয়েই থাকিব, বাপের বাড়ী এই পর্য্যন্ত। বুঝি এ জীবনে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না—মেজদিদি—মেজদিদি গো—

দাদাকে বলিও, আমাকে যেন ক্ষমা করেন। দাদাবাবু যেন রাগ না করেন, তাঁদের পত্র লিখিতে আমি সাহস করিলাম না, তুমি আমার হইয়া বুঝাইয়া বলিও। তোমার কথা উভয়েই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন—আজিও করিবেন, আর কি লিখিব? তোমায় মধ্যে মধ্যে পত্র দিব, উত্তর দিও। আর কি চাহিব? অনেক চাহিয়াছি,—যখন যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি। আজ তোমরা তিন জনে প্রাণ ভরিয়া তোমাদের অভাগিনী জন্মদুখিনী বোনকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে তাহার মৃত্যু হয়, যত দিন আমার চিতা-ভস্ম জাহ্নবী বারিতে বিধৌত না হইবে, ততদিন এ পাপের দাহ বুঝি নিবিবে না। হায় অদৃষ্টে তাও কি হইবে? তোমরা আমার প্রণাম গ্রহণ কর—ইতি

তোমাদের হতভাগিনী

সরলা।

২

এত কষ্ট করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছি, তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখি।

বলিয়াছি তো, সরলার অকাল বৈধব্য আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমি জানিতাম, বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা সব সমাজে, সব শাস্ত্রে, আছে—আমাদের ও শাস্ত্রে আছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া, শাস্ত্রের সার মন্থন করিয়া, নজির বাহির করিয়াছেন, এবং অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতি পক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। এখন লোকাচার এবং বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যা ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। সরলার এমন না হইলে একথা আমার মনেও উদয় হইত না, এমন কি অন্যে এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, ঘৃণায় নাক সিঁটকাইতাম এবং কত শত মিষ্টে কড়া বিদ্রূপ করিয়া লোকের কাছে রসিকতার বাহবা লইতাম। আজ নিজের গায়ে সাপের কামড় খাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাই এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যাইলাম। আগে একবার বাবার কাছে এ কথা তুলিয়া মোটা খাইয়াছিলাম। গ্রামের অনেকে আমায় ছি ছি করিয়াছিলেন, সেই থেকে আজ তিন বৎসর চুপ করিয়াছিলাম, মনে ভাবিলাম এখন আবার একবার সব নাড়া চাড়া দিয়া দেখিব—

দেখি সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত মহাশয়) কি বলেন, মেজদিদি বা কি বলেন।

সত্যেন্দ্র নাথ পাঠাবস্থায় পুরা সাহেব ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিতেন, স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য তর্ক করিতেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বিলাতে যাইবার জন্যও একবার নাচিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাহেবী পোষাকে থাকিতেন—সাহেবী পোষাকে তাঁর চেয়ে ভাল দেখাইতে আমি খুব কম ভারতবাসিকেই দেখিয়াছি। হঠাৎ তাঁকে দেখিয়া পার্শী অথবা কাশ্মিরী বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু আমার দেবী-প্রতীমা মেজদিদির পবিত্র স্নিগ্ধ সাহচর্য্যে তাঁহার এ সব ভাব এখন অনেকটা গিয়াছে। (যাক্ সে সব কথায় আমার কাজ নাই)। মেজদিদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপিণী, তাঁর সহোদর হইয়া আজ আমিও ধন্য।

সত্যেন্দ্রবাবু মেজদিদিকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, আবার মেজদিদিও তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। যেন সত্যেন্দ্র নাথ অগ্নি, মেজদিদি ঘৃতধার—দুইয়ের সংস্পর্শে জীবনী-শক্তি-দাত্রী স্নিগ্ধ স্রোতস্বতী বহিয়াছে। মেজদিদি প্রথমে ভারি গোঁড়া ছিলেন, সত্য বাবু একদম্ সাহেব ছিলেন, এখন দুটীতে মিশিয়া দুজনেই সহজ পথে চলিতে শিখিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য সুন্দর ও স্বাভাবিক—দেখিয়াও সুখ।

আমার পরামর্শ লইবার এমন স্থান আর আমি কোথায় পাইব? তাই এখানে আসিলাম, মেজদিদির কাছে গিয়া আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম, কিন্তু তিনি আমায় অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই আজ কাল বড় বেহায়া হয়েছিস্, বছর কএক ক'লকাতায় থেকে একেবারে উৎসন্ন গেছিস্, বড় মুড়্লী করিতে শিখেছিস্, আমার সামনে দাঁড়াইয়া ওসব কথা বলিতে একটু লজ্জাও করে না? আগে যে ক'লকতা থেকে বাড়ী এলে 'বৌ কেমন আছে'—জিজ্ঞাসা করলে লজ্জায় কান লাল হ'য়ে উঠ্তো সাম্নে দাঁড়াতে পার্তিস্ না! আর আজ বাবা নাই ব'লে, সংসারের কর্ত্তা সেজে বড়——" আর বলিতে পারিলেন না, বাবার নাম করিতে কোমল-হৃদয়া মেজদিদির চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল বহিয়া আসিল, আমি বেকুব হইয়া ফিরিবার চেষ্টা দেখিলাম, তখন অর্দ্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমায় ডাকিয়া বলিলেন "এখন বাড়ী যাস্নে, আমার ঘরে গিয়া বোস্, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।" আমি তাঁহার ঘরে না গিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, বাহিরে সত্যেন্দ্র নাথের কাছেই আসিলাম।

মেজদিদি আমার চেয়ে চারি বৎসরের মাত্র বড়। কিন্তু তাঁহার চেয়ে অধিক ভয় ও ভক্তি করি, এমন কেহ আপাততঃ পৃথিবীতে জীবিত নাই। আমি যে ঠিক হিসাব করিয়া বা বিচার করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করি তাহা

নহে। তাঁহার সেই আদর মাখানো বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বরে, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই বাসন্তী প্রতীমার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তিতে কি যে শক্তি লুক্কাইত আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, যেন তাঁর কাছে আমি কতক্ষুদ্র, বয়সে কত ছোট, জ্ঞানে কত মূঢ়। বুঝিয়াছি, এ শক্তি কেবল সেই মহা-শক্তির সাক্ষাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি নারীতেই সম্ভবে,—আর কোথাও নহে—How divine a thing a woman can be! কেন, কে না দেখিয়াছ, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তরুণী, কেমন গৃহিণী সাজিয়া, একটি বৃহৎ সংসারের "মা" হইয়া বসিতে পারেন? নারী যে মায়ের জাতি, এই মায়ের জাতির প্রতিও যে নরাধম অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, সে নরকের কুক্কুর? আর এই পবিত্র নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার মা হইবার শক্তি নাই, পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের শক্তি নাই, তাহাকে কি বলিব? থাক—

(৩)

বৈঠকখানায় গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এ কথা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, "তোমার আগে থেকেই সে ভাবনা আমার মনে আসিয়াছে, কা'ল রাত্রিতে এ কথা লইয়া তোমার মেজদিদির সঙ্গে আমার ভয়ানক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, তিনি তো রাগিয়াই অস্থির। এখন কি করি বল দেখি?"

আমি। মেজদিদির অমত থাকিলে, এ প্রসঙ্গ লইয়া অগ্রসর হওয়া কতদূর সম্ভব ও উচিত হইবে বলিয়া বিবেচনা কর?

স। এক বিন্দুও নহে, আমার সাধ্য কি? তুমি তো অজ্ঞান নও, তাঁকে বিলক্ষণ জান তো।

আ। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় কি?

স। বোধ তো হয়। আবার ইহাও জানি, আমার মত থাকিলে অবশেষে তাঁর মত হইবেই—তিনি ইচ্ছা করিয়া আপনার মত আমার মতে ডুবাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু কেবল আমার জিদ্ রক্ষার জন্য তাঁহার স্বাধীন স্বতঃ উদ্ভূত মতকে আমার মতের অনুবর্ত্তী করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না—সত্যেন্দ্রনাথের তাহা সাধ্যাতীত—

সত্যেন্দ্রনাথের চক্ষু ছল ছল হইল, কণ্ঠস্বর ভারী হইল। স্বর্গ আর কোথায়? —আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে দুই তিন বার ঢোক্ গিলিলেন, চক্ষু দুইটি আবার একটু শুকাইয়া আসিল, মুখের অন্যমনস্কতার ভাব গিয়া একটু সাধারণ ভাব আসিল, তখন আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন তবে উপায়"?

স। তোমার মেজদিদির প্রবল ভ্রাতৃস্নেহ এবং তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি আমায় সাহায্য করিবে, এই ভরসায় আশা করিতেছি যে, অবশেষে তাঁহার মত হইবে। এখন

হঠাৎ বড় দা লাগিয়াছে—এত পুরুষের বাপপরম্পরাগত সংসার কোথায় যাইবে?

আ। তারপর—সরলা?—

স। সে তখন আমি বুঝিয়া লইব—সে ভার আমার।

আ। পাত্র? পুরোহিত?

স। সেজন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে না—সে সকল ভারও আমার।

আ। এখন সমাজ।

স। সেইটাই প্রধান কথা। দেখি, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাড়িতে হইবে। তিনিই গ্রামের ও সমাজের নেতা, প্রবীণ, জমিদার, আবার এম-এ, বি-এল্, কিন্তু তিনি বড় গোঁড়া। তাঁকে এ বিষয়ে পাড়িতে পারিলে আর ডরাই না। তাঁর প্রতি আমার অটল শ্রদ্ধা, তাঁর অনভিমতে আমি কিছুই করিতে পারিব না। অন্য লোকের জন্য বড় ভাবি না, সব ঠাণ্ডা করিতে পারিব। অধিকন্তু, গ্রামে ও সমাজে এতগুলি নব্য ও শিক্ষিত যুবক আছে, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে বিলক্ষণ মান্য করে, এবং প্রত্যেককেই বুঝাইলে বুঝিবে। কারণ, আমি জানি, তাহাদের মধ্যে কেহই স্ত্রীলোককে কেবল পুরুষের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করে না, পরন্তু স্ত্রীজাতিকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করে। তাহারাও এ সৎ-কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া আমার ও ভবিষ্যৎ সমাজের সাহায্য করিবে। এখন বাকি রহিলেন তর্ক-রত্ন মহাশয়।

আ। হাঁ, তিনি তো এ কথা শুনিলে আমাদের আর মুখদর্শন করিবেন না, তাঁকে লইয়াই সমস্যা। স্বর্গীয় বিদ্যা-রত্ন মহাশয় আমাদের সঙ্গে মিশিতেন, আমাদের কাছে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র শুনিতেন, আর হাসিয়া হাসিয়া আমাদের সব 'ইংলিশম্যান' বলিতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সরল ভাবে কত কৌতুক করিতেন, কত বেদান্তের কথা বলিয়া আমাদের কিশোর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতেন। এ সব দেখিয়া তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদা বলিয়া যাইতেন, বলিতেন "বিদ্যারত্ন ভায়াও দেখ্‌ছি গোল্লায় গেলে"।

স। তিনি আমার উপরেও সম্প্রতি একটু চটিয়াছেন। সে দিন সকাল বেলা আমার এখানে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ বিশ্বপ্রেমে অভিভূত হইয়া আমার পিণ্ডের যোগাড় করিতেছিলেন, কিন্তু আমার পিণ্ডের লোভ কম দেখিয়া বড় হতাশ হইয়াছেন, একটু রাগও করিয়াছেন।

আ। তা'র কারণ?

স। তার কারণ,—যেহেতু তোমার সেজদিদি-রূপ বৃক্ষে আজিও ফল ধরিল না, সেই হেতু, তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে, আমাকে এতদিন বৃক্ষান্তর অবলম্বন করা অর্থাৎ আর একটী স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা উচিত ছিল। এতদিন যে করি নাই, ইহা অপেক্ষা আমার বোকামীর প্রমাণ আর হইতে পারে না। তাঁর সন্ধানে যে একটী ভাল পাত্রী আছে, সে প্রলোভনও সম্মুখে ধরিয়া

ন্যায়ের যুক্তির অঙ্গ-পূরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

আ। তারপর?

স। আমি বলিলাম "সাধু, সাধু!!"

আ। তারপর?

স। তারপর আমাকে এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

আ। চিন্তা করিয়াছিলে বোধ হয়?

স। আলবৎ। গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, পাক্কা ছয় ঘণ্টা হাবুডুবু খাইয়া, যে সিদ্ধান্ত-রত্নের উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এই যে,—বুড়া বয়সে কে আবার এক্সপ্লটিস্ খাটিতে বসিবে?

আমি বলিলাম "এখন বাজে কথা রাখ, কাজের কথা বল।"

স। কাজের কথা আর কি, যেমন করিয়া হৌক তর্ক-রত্ন মহাশয়কে তো চাই। যা হৌক, সমাজে যখন তাঁর এতদূর পসার প্রতিপত্তি যখন তিনি খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর্টিকেল্ লেখেন, তাঁকে চাই বৈ কি। নগদ কিছু বেশী করিয়া ঝাড়িলেই "মাকড় মারিলে ধোকড়" হইবে। দেখা যাক্। তুমি একবার তাঁর ওখানে যাও, তোমার সঙ্গে বনে ভাল। আমি ততক্ষণ চন্দ্রনাথ বাবুর কাছ থেকে হ'য়ে আসি এ ব্যাপারে ঝাঁটা লাথি অনেক খাইতে হইবে, মেজাজ ঠিক রাখিও—তোমার তো যে মুখ।

আ। আমার মুখের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। শ্রীমতীর কল্যাণে এখন এ মুখ অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ছুট্ ছাট্ বাহির হইয়া পড়ে—সেটা আগেকার অভ্যাস দোষে।

স। চিরকাল কি পাগল থা'কতে আছে? ছোট বেলায় তোকে সকলে পাগলই বলিত, যাকে যা ইচ্ছা বলতিস—কেউ কিছু মনে ক'রত না। দেখ্ দেখি, তর্ক-রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ, আর তুই তাঁকে কি না বলিস্, কিন্তু তিনিও তোকে কিছু বলেন না। এখন বড় হয়েছিস্ একটু বুঝে চল্‌তে হবে।

আ। যে আজ্ঞা প্রভু—যে আজ্ঞা।

(৪)

মেজদিদি যে খাবার আনিয়াছিলেন, তাহা গো-গ্রাসে উদরস্থ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদার রাশ-মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। তখনো বেশ বেলা আছে।

শিষ্য, সেবক ও যজমানদের কল্যাণে এবং মোটা মোটা শ্রাদ্ধের বিদায়ের দৌলতে তর্ক-রত্নমহাশয়ের অবস্থা বেশ ভালই। পাঁচ ছয়টা কুঠারী, দরদালান, পূজার দালান, একটি ফুলবাগান ইত্যাদি সবই আছে, কোন অভাব নাই। বামুন কায়েতের ঘরে মেয়েরও অভাব নাই, দুটা খাইতে দিতে পারিলেই যখন ইচ্ছা, যেমনটী ইচ্ছা, যত গুলি ইচ্ছা পাওয়া যায়। এক গৃহিণীর একটু বয়স বেশী হওয়াতেই গৃহিণ্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, শুনিয়াছি তাঁহার শেষ

গৃহিণী কিছু মখরা—তেমন good boy'টীর মত দোষ মানিতেছেন না। বলা বাহুল্য তর্ক-রত্ন মহাশয় কুলীন বংশ-সম্ভূত। তাঁহার পিতামহের আমল হইতেই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের" ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইনিও সেই পথাবলম্বন পূর্ব্বক চারিটী গৃহিণী পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্বর্গ-ফল-লাভ করিতেছেন। যেহেতু শাস্ত্রে বলে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," এবং তিনি খোদ এক জন হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, এজন্য চারিটী জীবন্ত মেয়েমানুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, যথাক্রমে এই চারিটী সোপান-রূপে নিয়োজিত করিয়া, তার উপর দিয়া স্বর্গে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন।

আমি গিয়া বরাবর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যাহারা সহর-বাসী তাহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া শিহরিবে, কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক আমাদের অতশত নাই। গিয়া দেখি ছোট ঠান্‌দিদি দালানে বসিয়া মেজ-ঠানদিদিকে দিয়া চুল বাঁধাইতেছেন। তিনি বাঁ হাতে চুলের গোড়ার সরু ফিতার দুই অগ্রভাগ মুখের দুই পাশ দিয়া আনিয়া, টানিয়া ধরিয়া আছেন, এবং ডা'ন হাতে দো ঠেজো আয়না খানিকে অনেক রকম করিয়া একা'ত ওকা'ত করিয়া ধরিয়া, অতি মনোযোগের সহিত তাহার পেটের মধ্যে চাহিয়া আছেন। তাঁর মুখে আনন্দের সঙ্গেও যেন একটু বিরক্তির ভাব মাখান, —বোধ হয় আয়নাখানিকে কোন রকম করিয়া ধরিয়া মুখ খানা এর চেয়ে কেন ভাল দেখাইতেছে না, ইহাই বিরক্তির কারণ। আশে পাশে চিরুণী, কাঁটা, ফিতা, গুছি, তেলের বাটি, সিঁদুর কৌটা, তরল আল্‌তার শিশি, একখানি রঙ্গিন আধ-ভিজা গামছা ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। আমার চটি জুতার শব্দ নিকটস্থ হইতেই ছোট-ঠান্‌দিদি একটু সাম্‌লাইয়া বসিলেন। মেজ ঠান্‌দিদি আহ্লাদ সহকারে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন "এস দাদা এস, বলি আজকাল না'তবৌকে ফেলে বুঝি বাড়ী থেকে বেরুতে পারিস্ নে? আগে যখন ক'লকেতা থেকে বাড়ী আস্‌তিস্, তখন যে সকলের আগে এ'সে আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তিস্, সমস্ত গাঁ রৈ রৈ ক'রে বেড়াতিস্, এখন বুঝি না'ত বৌ আর বেরুতে দেয় না?" আমি বলিলাম "হাঁ গো হাঁ, এখন ঠাকুর দাদা কোথায়?" তিনি বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া আমার আর কি কাজ থাকে?—কোথায় তিনি?" মেজ ঠান্‌দিদি ঠোঁট দুটী দাঁতে একটু চাপিয়া, ভ্রু-দুটী টান করিয়া, সেই সঙ্গে চখের তারা দুটি উপরে তুলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া ইসারা করিলেন "উপরে" অর্থাৎ ছাদে।

ছোট্‌ঠান্‌দিদি এতক্ষণ আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর মাথা অবশ্য খোলা, যেহেতু মেজ ঠানদিদির হাত চলিয়াছে, বিউনি প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার মুখ চুলকাইয়া উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম ছোটঠান্‌দিদি! মুখত ঢাকিলে,

মাথা যে খোলা, আমার তো খুব মান রাখিলে দেখ্‌ছি"। বলিতে বলিতে ছোট ঠান্‌দিদির অঙ্গ-যষ্টি থাকিয়া থাকিয়া আমায় ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিলাম নাভিকুণ্ড হইতে হাসির কতক গুলি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ক্রমে উপর পানে উঠিতেছে। মেজ-ঠান্‌দিদি আমায় বলিলেন "তুই শালা আমার মানুষ", আমি বলিলাম "উঁহুঁ"। এতক্ষণে হাসির বুদ্বুদ গুলি ছোট ঠান্‌দিদির গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপা দেখিয়া পথ না পাইয়া, নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে লাগিল। সেই চাপা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঠান্‌দিদির একটি চাপা চড় চপাট শব্দে তাঁর পিঠের উপর পড়িল, আমিও সময় নষ্ট করা অন্যায় বিবেচনায় চটির পট্ পট্ শব্দ করিয়া সিঁড়ির ঘরের দিকে চলিলাম। দেখিলাম তর্করত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র-রত্ন শ্রীমান বিভূতি ভূষণ আল্‌-বার্ট ফ্যাসনে কেশ বিন্যাস করিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমায় বলিলেন "কিহে—বাবাজি যে?" আমি একটা 'হুঁ' দিয়া পট্ পট্ করিয়া বীর দর্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম; ইদানীং তর্করত্ন মহাশয়কে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইত, কারণ তাঁর দিকে চাহিলেই "অলিভার টুইষ্টের" গোড়ায় যে এক "বীডলের" ছবি আছে, আমার তাই মনে পড়িত। ঠিক তেমনি তাঁর কান্তি-পুষ্টি। এজন্য সিঁড়িতে একটু দাঁড়াইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া লইলাম। বলিয়া রাখি,—বিভূতি ভূষণ আমার বয়সী।

উপরে গিয়া দেখি তর্করত্ন ঠাকুরদা আলিসার উপর একটী নেড়া সেতি টবের পার্শ্বে বসিয়া আকাশের পা চাহিয়া আছেন। বাম হস্তে ভুঁড়ীটে হাত বুলাইতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে এ খানি ঝালর দেওয়া পাখা, মধ্যে মধ্যে নাড়িতেছেন। বেলা অধিক নাই, গায়ে মাথায় কোথাও একটু আধটু ভাঙ্গা চু রৌদ্র আছে, গরমও বিলক্ষণ পড়িয়াছে আমায় দেখিয়াই একটু থতমত হই বসিলেন, বলিলেন "কিরে পাগ্‌লা তোকে আর আজ কা'ল দেখি কেন?"

"আজ্ঞে না দেখ্‌লে আর কি করিব? আমিতো পালিয়ে থাকি না বলি এখানে বসিয়া আকাশ পানে চাহি আছেন কেন? সেজ ঠানদিদিকে আজ এক মাস বাপের বাড়ী গিয়াছে এতেই এত?"

তর্ক—দূর শালা উল্লুক!—কেব পাগ্‌লামী ক'রেই রাত্তিদিন বেড়াবি —ওরে তোর নাকি বৌ পছন্দ হ নাই? তোর দিদি বলে "ঘরে এ অলক্ষ্মী ঢুকে অলক্ষণ হ'য়েছে।" তুই নাকি বিয়ের পর থেকে কেমন তর হ গেছিস্? তুইতো বরাবরই পাগ নইলে আর আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিস্ কলিকাল কি না! আমি আর ও তোর ভবিষ্যতে ভাল হয়, সেই জন্য গে

বেচে এই মেয়ে ঠিক ক'রলাম, এমন কুলীনের মেয়ে, তারা বনিয়াদি ঘর—

আ—সেজন্য চিরবাধিত আছি।

তর্ক—তবে তোর বোন অমন কথা কেন বলে? আবার ছুঁড়ী বলে কি না "স্ত্রী-হীনা স্ত্রীলোক লক্ষ্মী-ছাড়া—কারণ শ্রী অর্থেই লক্ষ্মী—শাস্ত্রের বচন", সরোজিনী আজ কাল ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে! আমায় আবার সব পুরাণ থেকে নজির শুনায়। বিদ্যারত্ন ভায়া আরও ওকে মাটি ক'রে গিয়েছেন। এদিকে সরোজিনী খুব গৃহিণী কায়দায় ঘরদুয়ার সাজিয়ে রাখে। বাধ হয় সতা নিজে পর্য্যন্ত কখনও তাকে একটা চুরুট এনে দিতে অনুরোধ করে না। সে নাকি বাড়ী থেকে এক পা গাড়ী ভিন্ন যায় না, সিল্কের পোষাক না প'রে বাড়ী থেকে বেরোয় না। আবার শুনেছি বিদ্যারত্নকে সে নিজে হাতে তামাক সেজে খেতে দিয়েছে। নল তৈয়ার করিবার জন্য পাতা পেড়ে এনে দিয়েছে—এদিকে তো বাড়িতে এত চাকর চাকরাণী। সে আমায় কি না বলে "আপনার কি প্রভুর প্রতি একটু দয়াও হয় নাই?" আরে গেলরে—

আ—সে সব কথায় কি কান দিতে আছে?

তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ বলিলেন "তোর মুখখানি বেশ। তবে তোর পেটে পেটে অত নষ্টামি কেন?"

আমি বলিলাম, "জন্মগ্রহের দোষ। বলি সে কথা যাক্, এখন একটু ভক্তি রসে মন দিলেই তো বেশ ভাল দেখায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিসৃত সেই গীতামৃতখানি কি এ বয়সে পড়তে হয় না?

তর্ক—আমার হয় না, তোর নাকি হয়? তোর। ত ঘোর নাস্তিক। আমি যে গীতার অনুবাদ ক'রে রেখেছি, গীতাই ছাপতে যাবে, আহা! ঠাকুর কি লীলাটাই করেছেন!

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোকের বাটীতে দুগ্ধের আবশ্যক। দুগ্ধ ভিন্ন গৃহস্থের চলে না। সন্তান সন্ততি সকল বাটীতেই আছে। অন্নীর কৃপা যত হউক না হউক বন্নীর কৃপা বিলক্ষণ। সুতরাং দুগ্ধ গোকুলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। দুগ্ধবিক্রেতা "খোসী" ও গোয়ালা নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ঘোষীগণ হিন্দু। তাহারা কেবল মাত্র মহিষ পুষিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন পেষা নাই। তাহারা হালোয়াইকে (ময়রাকে) দুধ বিক্রয় করে এবং খোয়া (ক্ষীর) প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে ক্ষীর পাতলা

হইয়া থাকে কিন্তু এদেশের ক্ষীর গাঢ়। গোয়ালারা আহীর বা গাড়ারিয়া জাতি ভুক্ত। তাহারা গরু ও মহিষ পুষিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ প্রায় বিক্রয় করে না। তবে কেহ করমাইস করিলে তাহা যোগাইয়া থাকে। তাহারা বাটীতে আবশ্যক মত দুধ দেয় এবং গাভী লইয়া লোকের দুয়ারে দোহন করিয়া দেয়।

উত্তম শ্রেণীর মহিষের মূল্য ৭০ বা ৮০ টাকা। এ সকল মহিষ ১২ হইতে ১৬ সের পর্য্যন্ত দৈনিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই দুগ্ধ হইতে সের করা এক বা দেড় ছটাক নবনীত অথবা ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর মহিষের মূল্য ২০ হইতে ৩০ টাকা। এ সকল মহিষ ৭ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। উত্তম শ্রেণীর গাভীর মূল্য ২০ হইতে ৪০ টাকা। ৮ হইতে ১৪ সের দুগ্ধ উত্তম শ্রেণীর গাভী হইতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাভীর দর ৪ হইতে ১০ টাকা। সে সকল গাভী ২ হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর মহিষ পুষিতে দিন ৷৶০ দশ আনা খরচ পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ ঐ ।৵০ আনা।

প্রথম শ্রেণীর গাভী ঐ ৷৷০ আনা।

দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ ৷৵০ আনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিষের গোবর হইতে দিন দুই পয়সা এবং গাভীর গোবর হইতে সওয়া দুই পয়সা লাভ হইয়া থাকে।

আজকাল টাকায় দুগ্ধ ৮ সের এবং ঘৃত ১৩ ছটাক। নবনীত টাকায় এক সের। ঘোষী বা গোয়ালারা ধর্ম্মত কার্য্য করে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাহারা প্রত্যেক তিন সের দুগ্ধে এক পোয়া ঘোল মিশাইয়া দেয়। মহিষ বৎসরে ১০ মাস এবং গাভী আট মাস দুগ্ধ দিয়া থাকে। মহিষ বা গাভীর দুধ ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকে পরে এক তৃতীয়াংশ এবং তৎপরে দেড় ভাগ কমিয়া যায়।

মহিষ হইতে কিরূপ লাভ হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি :—

ষোল সের দুধ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত নবনীত ৪ ছটাক, ঘোল ৩৲ সের, গাঁটি ঘৃত ১২ সের পাওয়া যায়। ইহার দাম যথাক্রমে চারি আনা, সাড়ে পনের আনা এবং ঘুঁটের দাম দুই পয়সা। একুনে ১ টাকা ।০ চারি আনা ৬ পাই।

মোট কথা খরচ খরচা বাদ দুগ্ধ বিক্রেতার বৎসরে ১০৩ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

রাজা রাম মোহন রায়ের স্মৃতিসভা।

৮২ বৎসর পূর্ব্বে ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের ব্রষ্টল নগরে নব্যবঙ্গের জন্মদাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার জন্ম দ্বারা পূর্ব্ব এবং মৃত্যুদ্বারা পশ্চিমকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সুধীসমাজ বঙ্গের এই মহাপুরুষকে বৎসর বৎসর এই দিনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন।

গত সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে এই মহাপুরুষের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজার স্বরচিত "ভাব সেই একে" সঙ্গীতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সঙ্গীতান্তে পূজনীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অতি সংক্ষিপ্ত সময়োচিত প্রার্থনা করেন। অতঃপর আর একটী সঙ্গীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় রাজার বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। রাজার সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি তাহার আবেগ পূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

আমরা সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা।

আপনারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার মুখে শুনেছেন যে রাজা রামমোহনের কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম্ম-বৈচিত্র্য বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলিব। এতাবৎ কাল আমরা তাঁর স্মৃতি সভায় কেউ তাঁহার রাজনীতি কেউ শিক্ষা বিস্তার কেউ সমাজ সংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুক্‌রা টুক্‌রা করে কোন মহৎ-চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষতঃ যে খানে রাজা রাম মোহনের মহত্ত্ব, তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা, কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা'হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার ক'রে অপমানিত করতে হবে,

এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে আশ্রয় করে, রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলে পূজা করিতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।" সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্চে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলই সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ছন্ন করা, বেষ্টিত করে এবং তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এক অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই একেকেই তিনি দেশাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসী সকলকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বললেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এই খানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একেকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন—"ভাব সেই একে।"

আজকার সভার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত—"ভাব সেই একে" ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়। বিদ্যায় বড় যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক দিয়া দেখলে চলবে না, তিনি একেকে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা কড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর

সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এক সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। তাকে না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের জলধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্তে ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।"

এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী, ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্চি তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করচি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই, সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা আকর্ষণ করতে না পারলে, আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তাঁরা বস্তুতেই বড় হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড় না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড় হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা একথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। উদ্ধৃত

জাপানে স্ত্রীশিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য।

আজকার সম্মিলনে কেহ বা আমার পূজনীয় কেহ বা সমবয়স্ক—যাহাদের সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শে বর্দ্ধিত হইয়াছি—কিন্তু অধিকাংশই আমার কনিষ্ঠ—তাঁহাদেরই বিশেষভাবে আজ সম্বোধন করিতেছি। আমি বক্তা নহি। এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ্য সভায় কিছু বলি নাই—তবে আজ কেন

সম্মত হইলাম। দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ না করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাই স্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আজ দু চারটী কথা বলিব। যদি আমার হৃদয়ের আশা ও উৎসাহের কণামাত্র আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমারা যে জিনিস প্রত্যহ দেখি এবং যাহা অনায়াসে পাই, তাহার মূল্য বুঝি না, এমন কি তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। আবার এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতে করিতে আমাদের চক্ষে অভাবগুলিই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়, আমরা বড় করিয়া দেখিবার শক্তি হারাই।

এজন্যই আমাদের মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত মনে করি। প্রবাসে গেলেই আমরা প্রতিদিনের বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাই, যেগুলি আমাদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের আনন্দ দিয়াছে, সেগুলিই মনে আসে। দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়া উঠে এবং দেশের সামান্য জিনিষের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া নূতন স্থানে আমাদের আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তি বাড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুস্তক হইতেই—পুস্তকে আমরা কেবল আদর্শটাই জানি এবং সেই আদর্শের সহিত আমাদের দুর্বলতার তুলনা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদেরও নৈদন্দিন জীবন দেখিলে তখনই আমরা প্রকৃত বুঝিতে পারি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটাতে আমরা ছোট, কোনটাতে আমরা বড়। বিদেশে সব চেয়ে আমাদের মনে হয়, সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে, আমাদের দেশই কেবল সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার আর এক সুফল এই যে, সেখানে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা এক দেশের সন্তান। সেখানে ভারত সন্তানের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাই, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই ভারতের—ভারতবাসীরা আমেরিকাতে হিন্দু অথবা হিন্দুস্থানী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে যাহা সাধন কষ্টসাধ্য, বিদেশে তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে। বিদেশে যাওয়ামাত্র সকলে ভাই ভাই বলিয়া পরস্পরকে চিনেন—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৮।১০টী প্রদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক স্থানেই এই একতার ভাব দেখিয়াছি—এক স্থানে ছাত্রবাসে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম ছাত্রটী রন্ধন ও পরিবেশন করিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী কায়স্থ সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন, তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ।

আমেরিকাতে অধিকাংশ ছাত্রই

অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহা যে কতদূর শ্রমসাধ্য তাহা আপনারা জানেন। আমাদের দেশের কত দরিদ্র ছাত্র পাচকের কার্য্য করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন। আমেরিকাতে এই সব ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় যে সব ছাত্র এক নগরে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যে সব সময়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এক সাধারণ ফণ্ড করিয়া যিনি যখন যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা ভাগ করিয়া একে অন্যকে সাহায্য করেন। কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত কপর্দ্দক-শূন্য এই যুবকদের যেখানেই দেখিয়াছি, কাহারও মুখে নিরাশা বা ম্লানভাব দেখি নাই। আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—সকলেরই উদ্দেশ্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া উন্নতি করা। সকলেই দিন গণিতেছেন, কবে কর্ম্মক্ষম হইয়া দেশে ফিরিবেন।

আমাদের ভ্রমণকালে আমেরিকা, চীন, জাপান যেখানেই গিয়াছি, ভারতীয় ছাত্র বা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসী কোন না কোন কার্য্যোপলক্ষে বাস না করিতেছেন এবং আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা তাঁহারা ভারতের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন—ইহা কি কম আনন্দের বিষয়?

আমরা যেখানে গিয়াছি, ভারতীয় ভদ্রলোক ও যুবকদের আতিথ্য ও সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি এজন্য যে ভারতবাসীর এখন আত্মমর্য্যাদা বোধ ও আত্মজ্ঞান হইয়াছে—এক সময় ছিল যখন আমরা পরস্পরকে হিংসা করিতাম—এখন আর সে দিন নাই, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের সেবা ও যত্ন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃ-ভূমির সেবা করিতেছেন, এইরূপ অনুভব করিয়াছি। যাঁহাদের জীবনে কখন দেখি নাই অথবা আর কখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, কি ভারতে কি বিদেশে সেই সকল ভারতবাসী প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদের অতি আত্মীয়ভাবে সেবা ও যত্ন করিয়াছেন—ঘরের লোকের মতন ব্যব-হার করিয়াছেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে।

আজ আপনাদের নিকট নারীজাতির পক্ষ হইতে আমার একটী নিবেদন আছে।

এ সম্মিলনে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই, কিন্তু ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের নারীজাতির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। এ কথা

আপনারা সকলেই জানেন, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু আপনারা যে জানিয়াও জানিতেছেন না—আপনারা যদি সত্যই তাহা বিশ্বাস করিতেন, তবে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন? কেবল স্ব স্ব কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল?

দেশমধ্য নারীজাতি অশিক্ষিত রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি? স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, অনেক কবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কার্য্য কি হইতেছে?

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেই বা ক'জন চিন্তা করিতেছেন! আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা-প্রণালী ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী হইতে অনেক পুরাতন, আবার আমাদের স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীও তাহারই অনুকরণে গঠিত। আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা যে শিক্ষা বিষয়ে একেবারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিব তাহার কোন কারণ দেখি না। আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে শিক্ষাতে ভারতনারী তাঁহার নম্রতা, বিনয় ও কোমলতা হারাইবেন সে শিক্ষা চাই না। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে, প্রাদেশিকতা ভাঙাইয়া আমাদের দেশকেও বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং তদর্থে নারীজাতিকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন আমরা ছোটখাট বিষয় লইয়া দিন কাটাইতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমাদের নারীর জ্ঞান আহরণ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের এই সঙ্কল্প হউক যে ভারতে আবার সে দিন আনিতে হইবে, এবং আপনারা আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের মূলে কয়েকটী উৎসাহী যুবক ছিলেন। জাপানে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস পড়িলেও তাহাই দেখি। জাপানের যখন প্রথম চেতনা হইল তখন সকলেই পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই পাশ্চাত্য অনুকরণ যাহাতে বন্ধ হয়, যাহাতে জাপানী আচার ব্যবহার সুরক্ষিত হয়, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইল। জাপানে কোনও দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তাহাদের সামাজিক প্রণালী ইউরোপীয় নহে। যদিও জাপানী নারী অসঙ্কোচে রাস্তায় বাহির হন, কিন্তু পুরুষদের সহিত তাঁহাদের অবাধে মেশামিশী নাই। স্কুলের বালিকা, বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীগণ, ট্রামে, গাড়ীতে পুরুষদের সঙ্গে রাস্তায়াত করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটু ব্যবধান থাকে। কয়েকটী জাপানী যুবক, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা কি করিয়া জাপানে উচ্চশিক্ষার প্রচলন করিবেন, রাত্রিদিন

এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক এক নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেরাই তাহাতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল বিদ্যালয় যখন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন তাহার ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর দিয়া তাঁহারা অন্য নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের বিদ্যালয় সমূহ দেশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও অর্থে বর্ত্তমান স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি সেটী দেখিতে গিয়াছিলাম। টোকিও নগরের প্রান্তে একটী ছোটখাট গ্রামের মতন ইহার বিস্তৃতি। প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। লেখাপড়ার সহিত গৃহস্থালী, এমন কি আদব কায়দা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে কেবল যে সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় এমন নহে, গো-পালন, পশুপক্ষী পালন, কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। জাপানীরা তাহাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ম্বরহীনতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তাহারা নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে গৃহকার্য্য ও জীবন-ধারণ-প্রণালী গঠন করিয়া লইয়াছে। আর আমাদের জীবনধারণ প্রণালী দিন দিন আরও জটিল ও বিলাসিতাপূর্ণ হইতেছে। এই বিলাসিতা হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে নারীর উচ্চশিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই।

জাপান দেশ সব দেশ হইতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেশটী যেন ছবির মতন গোছান। বাড়ী, ঘর, রাস্তা, গলি কোথাও আমি কোন অপরিষ্কার জিনিষ দেখি নাই।

জাপান তাহার দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আধুনিক ও নব আবিষ্কৃত সব নিয়ম পালন করিতেছে কন্ ? স্ত্রীশিক্ষার ফলে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হইতেছে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের দেশেই কি কেবল পিছাতে রহিবে ? আমাদের নিজেদের চেষ্টা করিতে হইবে। কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল ও মেধাবী ব্যক্তিগণ ইউরোপে, আমেরিকাতে ও জাপানে গিয়া পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের জন্য কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রাণ-হীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। আমরা নারীদিগকে এরূপ কতকগুলি বিষয় শিখাইতেছি, তাহার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। জাপানে দেখিলাম নারীগণ বিবাহিতা হইয়াও কাজ করে। ইহা কিরূপে সম্ভব ? আমাদের শিক্ষিত বালিকাদের

বিবাহ হইতে তাহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে তাহাদের আর লেখা পড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার কারণ আমাদের সংসার গঠন সরল ও সহজ নহে। যত দেশে বেড়াইলাম, জাপান পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গৃহিণীরা গৃহ-কার্য্য ও সন্তান পালন প্রভৃতি করিয়া অবসর মত লেখাপড়ার চর্চ্চা ও সামাজিক কর্ত্তব্য সবই পালন করেন—কেবল আমাদের দেশেই আমরা দিন রাত আহারাদি গৃহকার্য্য লইয়া বিব্রত থাকি। ইহার কারণ বাহির করিয়া তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাপানে যে সকল মহিলা আমেরিকা ও জর্ম্মানী হইতে শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের বেতন ৭৫ টাকা মাত্র, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম যে আমাদের গরীব দেশ, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সে জন্য আমরা শিক্ষা প্রচার ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ৫০ বৎসরেরও কম হইতে জাপানে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে এইরূপ নারী চরিত্র গঠিত হইয়াছে, আর আমাদের মধ্যে ক'জনের কাছে এইরূপ কথা শুনিতে পাই? আমরা শিক্ষালাভ করিয়া নিজের সুখসচ্ছন্দতা ও সংসার লইয়া আছি—ক'জনের বা দেশের কথা মনে হয়—কয়জন শিক্ষা প্রচার—ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? যত দিন এই ভাবে আমাদের নারীগণ অনুপ্রাণিত না হইবেন, ততদিন শিক্ষা বিফল হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্বাপণ অনুসরণ করিলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করিবে। সে জন্য আমাদের ব্রতধারিণী ২।১টি মহিলাকে ইউরোপে পাঠাইয়া শিক্ষা প্রণালী শিখাইয়া আনিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ২।১টি মহিলাকে আনা আবশ্যক। ইহাতে কয়েকটী বিপদ আছে। পাশ্চাত্য রমণীর ব্যক্তিত্ব এত অধিক যে পচরাচর তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয় না এবং তাঁহারা আমাদের উপর আধিপত্য করিতে চান।

ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় স্বার্থশূন্য শিক্ষা-ব্রতধারিণী নারী সব সময়ে সব দেশে দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্য-বশতঃ খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটি উদার হৃদয়া নারীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহারা এদেশে আসিয়া আমাদের অধীনে থাকিয়া আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহা অর্থ সাপেক্ষ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্তই ছিল না, তখন একটী দরিদ্র অজ্ঞাত পণ্ডিতের প্রাণ নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নারীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইলেন—বাধা বিপত্তি না মানিয়া প্রবল উৎসাহে তিনি নারীজাতির উন্নতির সহায় হইয়া-

ছিলেন। সেই অবলা-বান্ধব কর্ম্মবীরের নাম কাহারও অবিদিত নাই। আজি তবে কি এই বঙ্গভূমিতে শত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অসম্ভব।*

শ্রীঅবলা বসু।

ইষ্টলিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রূণভঙ্গ।

লেডী ইসাবেলের শকট বরাবর মিসেস্ লেভিসনের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। এখন মিসেস্ লেভিসনের একটু পরিচয় দিই। মিসেস্ লেভিসনের বয়স প্রায় ৮০র কাছাকাছি, এবং তাঁহার স্বভাবটী অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কঠোর। মিসেস ভেন যেমন তাঁহাকে কষ্ট দিতেন ও কর্কশ ব্যবহার করিতেন তিনিও অনেকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

ইসাবেল যখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল তখন বৃদ্ধা লেভিসন অত্যন্ত অধীর ভাবে মাথার টুপী খুলিয়া, গাউন টানিয়া, গৃহের চারিদিকে চাহিয়া তাঁহার জন্য রক্ষিত আহারীয় দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। "আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি, আমার বিলম্বে আসিয়া পৌঁছানর জন্য," এই বলিতে বলিতে লেডী ইজাবেল মিসেস্ লেভিসনের দিকে অগ্রসর হইল। "কিন্তু কি করিব বাবা আজ একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণে আহার করিতে বলিয়াছিলেন সেই কারণে আমাদের আহারের বিলম্ব হইয়া যাইল।"

বৃদ্ধা একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "যে সময় তোমার আসিবার কথা ছিল তুমি তাহার ২৫ মিনিট বিলম্বে আসিয়াছ, যা হউক এসমা—এখন আমার চা আনিতে বল"।

মিসেস্ ভেন চা আনিতে আদেশ করিলেন। মিসেস্ ভেন দেখিতে ছোট খাট মানুষটী, বয়স ২৬ বৎসর, মুখখানি সাধারণের ন্যায় কিন্তু গঠনটী অতি সুন্দর। তিনি ভয়ানক গর্ব্বিতা স্ত্রীলোক, তিনি মাতৃহীনা। মিসেস্ লেভিসন তাঁর মাতামহী, এবং মি রেমণ্ড ভেন, তাঁহার স্বামী। তিনি আর্ল অফ্ মাউণ্ট সভারিণের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা।

মিসেস্ লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে ইসাবেল্, তুমি কি তোমার গায়ের কাপড় খানি খুলিয়া রাখিবে না? তোমাদের এই নিত্য নূতন ফ্যাসানের পোষাকের নাম কি তা আমি জানি না।"

---

* এই আপত্তি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজ কর্তৃক সম্বর্দ্ধন সভায় পঠিত।

ইসাবেল গাত্রাবরণ খানি খুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

"দিদি মা এখনও চা প্রস্তুত হয় নাই!" মিসেস্ ভেন আশ্চর্য্য হইয়া এই কথা বলিলেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ট্রে এবং রূপার চা পানের পাত্র সহল লইয়া প্রবেশ করিল। "তুমি কখনও এঘরে চা প্রস্তুত করিও না!"

মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "কোথায় তবে চা প্রস্তুত হইবে?"

মিসেস্ ভেন বলিলেন "একেবারে প্রস্তুত করিয়া আনিলেই ত হইত, এখানে আবার কষ্ট করে চা প্রস্তুত করিতে আমি ভাল বাসি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন "যা বলিয়াছ! ঠাণ্ডা চুল্লীর ন্যায় বিষাদ হইয়া যাউক! এমনা—তুমি সকল সময়ই ভয়ানক কুঁড়ে।"

দিদিমার পশ্চাতে ইসাবেলের প্রতি ঘৃণা পূর্ণ বিদ্বেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, মিসেস্ ভেন বলিলেন "কে তোমার জন্য সকল সময়ে চা প্রস্তুত করিবে?" কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ইসাবেলের প্রতি পতিত হওয়ায় ইসাবেলের গণ্ডস্থল লজ্জায় লাল হইয়া যাইল। সে ইহাদের আচরণ ভাল, না তাহার পিতার অন্যকার অতিথির আচরণ ভাল তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তাহার মন এই বৃদ্ধাদের চিন্তা ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল।

"হ্যারিট এস আমার জন্য ইহা প্রস্তুত কর," মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "হাঁ, ব'স, আমার সঙ্গে প্রস্তুত কর, আমি একা এমনা তুমি কি বল?"

"দিদিমা তোমার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ কর।"

"এমনা তোমার হাতের কনুয়ের কাছে চা'র পাত্র রহিয়াছে টানিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ কর। যদি তুমি আজ রাত্রিতে চা খাইতে ইচ্ছা কর, ভালয় ভালয় এই বেলা প্রস্তুত করিয়া ফেল", মিসেস্ লেভিসন বলিলেন।

পাছে হাতের দস্তানা খুলিতে হয় এই ভয়ে মিসেস্ ভেন বক্ বক্ করিতে করিতে বলিলেন "আমি চা প্রস্তুত করিতে জানি না।

উৎসাহের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইসাবেল বলিল, "আমি প্রস্তুত করিব, আমি বাটীতে বাবার জন্য নিজ হাতে চা প্রস্তুত করি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কর মা," "তুমি উহা হইতে দশগুণ ভাল প্রস্তুত করিবে।"

ইসাবেল আনন্দে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার হস্তের দস্তানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন সুন্দর যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই যুবকটী দেখিতে অতি সুন্দর। কৃষ্ণতার তাহার চক্ষু, কাক বিনিন্দিত কেশ কলাপ, শুভ্র দন্তপাতি ও সুগঠিত দেহ। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী কেহ ইহাঁকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। ইনি গৃহ কর্ত্রী বৃদ্ধা মিসেস্ লেভিসনের পৌত্র, এবং মিসেস্ ভেনের মাতুল পুত্র। (ক্রমশঃ)

একাদশী।

স্থানটা সমুদ্রের ধারে—ওয়ালটেয়ার। পূর্ব্বদিন সারারাত জাগিয়া—নাচ তামাসা দেখিয়া, একাদশী সমুদ্রের তীরে বালীর উপর একটা পাথরে মাথা রাখিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, সময় তখন মধ্যাহ্ন অতীত। স্নানার্থির বেশে একদল মেম ও সাহেব—ছোট বড় ছেলে মেয়ে সঙ্গে, কলিত-চপল হাসির লহরী তুলিয়া ছুটাছুটী লাফালাফি করিতে করিতে নিদ্রিত একাদশীর পাশ দিয়া, স্নানের জন্য সমুদ্রে গিয়া নামিল।

বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পর একাদশীর ঘুমটা তখন পাতলা হইয়া আসিয়াছিল, কাযেই স্নানার্থিগণের কৌতুক-উল্লাসিত সেই মধুর হাস্য ঝঙ্কারে নিজের আবেশ জড়তাটী রাখিয়া, নিদ্রা মহাশয় নিঃশব্দে পিটটান দিলেন, একাদশী উঠিয়া বসিল।

তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের ভিতর তখনও গত রাত্রির সেই নাচ তামাসার গোল-মালের জের চলিতেছিল, সুতরাং প্রথমটা নিদ্রোত্থিতের বারম্বার বিস্ফারিত-চক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া অবসাদ ঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিল, চারিদিকের দৃশ্যটা ভাল বোধগম্য হইল না, মনে হইল রঙ্গভূমিতে এক দল সং আসিল বুঝি!—হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া, চোখ রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিল,—নাঃ সং নয় সমুদ্র বটে!

তাইত—এত বেলা পর্য্যন্ত সে এখানে ঘুমাইতেছে!

ধড়্ ফড় করিয়া একাদশী উঠিয়া পড়িল। কোমর হইতে গামছা খুলিয়া, তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়া, গা, হাত, পা, মাজিতে লাগিল, অনেক বেলা পর্য্যন্ত রৌদ্রে পড়িয়া ঘুমানয় তাহার কণ্ঠা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, রাত জাগিয়া তামাসা দেখা কি নিগ্রহ!

ওদিকে সেই গোল্লি পরা, লালজামা আঁটা সাহেব মেমের দল, সমুদ্রের ঢেউয়ে নাকানি চুপানি খাইয়া, ঢেউয়ের তোড়ে, ছিটকাইয়া হেথা হোথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—ছেলেরা শুদ্ধ ছত্র ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের এক একটা ঢেউ প্রবল আবেগে উছলিয়া আসিতেছে, আর উলট্ পালট্ পরায়ণ স্নানার্থিবৃন্দের উচ্ছ্বসিত তরল হাসির ঢেউ বায়ু স্তর ছাপাইয়া উঠিতেছে! কি আমোদ! কি আমোদ!

তাড়াতাড়ি গামছা কাচিয়া, গোটা দুই ঢেউ খাইয়া, একাদশী জলে দাঁড়াইয়াই মাথা মুছিতে লাগিল, উষ্ণ মস্তিষ্কের রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন ভাবনা জুটিল এত বেলায় বাড়ী যাইলে দাদা কি বলিবে?

যাহা বলিবে তাহাত স্পষ্ট পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, অতএব সেটুকু বরদাস্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, সুতরাং সেই জন্যে মনটা পূর্ব্ব হইতে চাঙ্গা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কায।—

একাদশী গামছা পরিয়া জলে খেলাইয়া খেলাইয়া কাপড় খানা কাচিতেছে, এমন সময় একটা মস্ত ঢেউ আসিল, একাদশী টের পাইয়াছিল,—যেমন তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—অমনি পশ্চাৎ হইতে দুই শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র বাহু আসিয়া, তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে কচি কণ্ঠ নিঃসৃত—বিকৃত উচ্চারণে আধ আধুর অনুরোধ "ওগো আমায় ঢেউ খাওয়াও না!"

বিস্মিত একাদশী ফিরিয়া চাহিল সাত আট বৎসরের একটী সাহেব সন্তান!—কি সুন্দর ছেলে! স্নিগ্ধ প্রীতিতে একাদশীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

উন্মত্ত সিন্ধুর তটাভিহত ঢেউ আবার নামিয়া চলিল, পায়ের তলা হইতে বালী গুলো পর্য্যন্ত সরাইয়া!—ক্ষিপ্র হস্তে ছেলেটীকে আটকাইয়া ধরিয়া একাদশী ঢেউয়ের প্রখর বেগ ঠেলিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তীরে উঠিল, জলসিক্ত কাপড় খানা ঠিকঠাক করিয়া গুটাইয়া লুটাইয়া কোমরে কসিল।

ফুটফুটে সুন্দর দীর্ঘ, কলেবর ছেলেটী মুখ চোখের সবর্ণাক্ত জল, হস্ত দ্বারা অপনীত মুছিতে বিস্ফারোজ্জ্বল নীল চোখ দুটী ঘুরাইয়া খাড়া কৌতুকে, একাদশীকে দেখিতে লাগিল,—অদূরে তাহার সঙ্গীরা জলের ভিতর লাফালাফি করিয়া উচ্চে উচ্ছসিত কণ্ঠে হাসিতেছে,—হা-হা-হা-কা-হা!

বেলা ঢের হইয়াছে, একাদশী এখনো কিছু খাইতে পায় নাই, তবু এই অপরিচিত ছোট বালকটীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, বুঝি এড়াইবার ইচ্ছাও ছিল না। এই ছোট ছেলেটীর জন্য সে আবার জলে নামিতে প্রস্তুত হইল, এবার নামিলে যে শীঘ্র উঠা হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিল, তথাপি কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিল না! এই কোমল কচি ছেলেটীকে খুসী করিবার জন্য তাহার মুখে নিজে একটু দুর্ভোগ স্বীকার করিতে সে কি এমনি রসজ্ঞহীন—না!

ভাইত যাহা বলিবার তাহা বলিলেই, না হয় আর একটু বেশী করিয়া বকিবে, তা বলিয়া—না!

একাদশীর মুখে নির্ভীক উৎসাহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কোমরে গামছা বাঁধিয়া শিশুদর্শন বালকটীকে পিঠে লইয়া, সে সাঁতার করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া গেল,—"চল সাহেব সাঁতার দিয়ে তোমায় ঢেউ খাইয়ে আনি!"

ছোট বালকের ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে ঢেউ খাওয়াইতে পারে নাই! আহা এই লোকটী কি ভাল! কি অদ্ভুত ইহার সাহস!—উল্লাস আবেগে বালক গলদেশে একাদশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল!

ডিপ্‌থারী ও সাঁতারের নানাবিধ কসরতের সহিত প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া, জলরাশির সহিত যোঝাযুঝি করিয়া ছেলেটীকে পিঠে লইয়া একাদশী সাঁতার কাটিয়া বেড়াইল! তাহার পর সাহেব গোরার সৈন্যকে একে একে তীরে উঠিতে

দেখিয়া একাদশীও তীরে উঠিল, ছোলটীকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজের কাপড় গামছা নিঙ্ড়াইয়া পরিতে লাগিল।

শীস্ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে বালক আত্মীয়দের দিকে ছুটিল "বাবা, বাবা, খুব মজা হয়েছে, আমি এক অপরিচিত বন্ধু পেয়েছি!"

পিতা সবে জল হইতে উঠিয়া হাঁটুর পাজামা গুটাইতে ছিলেন, অন্যমনে বলিলেন "কি হয়েছে ক্লরিণ, কি পেয়েছ?"

"বন্ধু বাবা, অপরিচিত বন্ধু, ভারি ভাল!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাহার দিদি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "কোথায়?"

"ঐ যে ঐ কাপড় পরছে!"

"আরে বাঃ! ও আমাদের মেহর আলী নয়? আমরা মনে করিছিলুম তুমি বুঝি মেহর আলীর পিঠে আছ, ও কে?

"ডেকে আন দেখি—"

আচ্ছা আনছি," বালক সোৎসাহে ছুটিল! গামছা মাথায় জড়াইয়া একাদশী তখন ঘর মুখো হইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ফ্লরিণ গিয়া একেবারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল "আরে এস এস, তোমায় আমার বাবা ডাকছেন!"

কি বিপদ! আবার ডাক!—মিনতির স্বরে একাদশী বলিল "কাল হবে সাহেব আজ ঢের বেলা হয়েছে, আর বেশী দেরী হলে বাড়ীতে বকবে!"

"তোমায় বকবে? চোখ দুটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বালক বলিল "তোমায় বকবে?"

যেন একাদশীকে তিরস্কার করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে থাকাটা ভারি অসম্ভব।

একাদশী মৃদু হাসিল—"চল সাহেব বেলা তো হয়েছে, আর একটু হোক্, চল দেখা করে আসি।"

"এস এস"—খুব ব্যস্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া ছেলেটী টানিয়া লইয়া চলিল দলবলের কাছাকাছি হইয়া একেবারে উচ্চ কণ্ঠে অভিযোগ ঘোষণা করিল, "বাবা দেরি করে গেলে বন্ধুকে বাড়ীতে বকবে। শীঘ্রী ছেড়ে দিও।"

ছেলেটীর অযাচিত ওকালতীতে একাদশী ভারি লজ্জায় পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি আরক্ত মুখে সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, ভিজা গামছা খানা গায়ে জড়াইয়া সসঙ্কোচে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব দেখিলেন পুত্রের বন্ধু এক ষোল সতের বছরের তরুণ বালক, তাহার রংটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বেশ সুশ্রী, চোখ দুটী স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত, মোটের উপর ছেলেটী বেশ কমনীয় বটে! হঠাৎ দেখিলেই যেন ছেলেটীর উপর ভারি মমতার উদ্রেক হয়, সাহেব স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা?"

"একাদশী"

"কি জাত"

"মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ"

তোমার বাপ মা কে আছে?

"কেউ নাই সাহেব, শুধু ভাই আছেন"

উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া সাহেব জানিলেন তাহাদের বাড়ী এখান হইতে আধ ক্রোশ তফাতে, তাহার দাদার এক দোকান আছে, সেই দোকানেই সে কাজ করে, লেখা পড়া সামান্যই জানে, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই।

"বেশ ঐ দেখ আমার হল্‌দে রংএর কুঠী, আজ বৈকালে ঐ খানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, বুঝলে?"

"বহুত আচ্ছা সাহেব।"

(২)

দিন পনের পরে—সাহেবদের অনেক জেদাজেদী ও একাদশীর আগ্রহাতিশয্যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া একাদশীর দাদা, ভাইকে সাহেববাড়ী চাকরী করিতে দিতে সম্মত হইল।

সিদ্ধ-মনোরথ একাদশী প্রফুল্ল মুখে আসিয়া কাযে লাগিল, কাজ কেবল সাহেবের ছোট ছেলে রোগগ্রস্ত ফুরিণের সাহচর্য্য। ফুরিণকে লইয়া চারিদিকে বেড়ান, নানা উপায়ে তাহাকে খুসী রাখাই, একাদশীর কায,—অপর রীতিমত খেলাও বলা যাইতে পারে!

ফুরিণ যক্ষ্মাকাশ রোগগ্রস্ত, তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্যই সাহেব পরিবার এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। সাহেব বঙ্গ দেশের কোন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, আপাততঃ ছুটিতে আছেন।

ছুরিত রোগ বলিয়া পিতামাতা চিকিৎসকের মতানুসারে ফুরিণকে একাকী স্বতন্ত্র কক্ষে নিদ্রা যাইতে দিতেন, এতদিন পর্য্যন্ত বালক এ নিয়ম নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত দিনের পর একাদশীকে পাইয়া তাহার মত বিগ্‌ড়াইয়া গেল, বাড়ীর লোকে ব্যবস্থা করিল ফুরিণের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে একাদশী শুইবে, কিন্তু একাদশী ও ফুরিণ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া সে নিয়ম একেবারে উল্টাইয়া ফেলিল।

সকলের সংসর্গ হইতে ফুরিণকে যে একটু স্বতন্ত্র রাখা হয়, এটা একাদশীর নিকট অমার্জ্জনীয় অন্যায়! কেন রে বাপু, এতটুকু কোমল সোণার শিশু, সে কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে এমন নিদারুণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে? সে কাহারও সহিত ইচ্ছামত মিশিতে, খেলিতে পাইবে না,—অস্পৃশ্য প্রাণীর মত ছুরে ছুরে থাকিবে, কেন—একি অন্যায়? না, যে পারে সে এ ব্যবস্থা মানিয়া চলুক, একাদশী ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, কিছুতেই না!

তীব্র বিষাদ তাহার মনের মধ্যে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, এমন নিষ্ঠুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার মনটা অত্যন্ত বিদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইল। না, সে একলাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, না থাক সাহায্য, নাথাক সম্বল, সমস্ত ধাক্কা সে একলাই সাম্‌লাইবে।

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সব চিন্তা ও যন্ত্রণা না সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দনী অবসন্ন দেহে একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডপতিরই শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে ডাকিতে না ডাকিতেই তাঁহার চিন্তা জনিত অবসন্নতা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন চারি দিকেই তাঁহার নিজের বস্তু, নিজের জন। মস্তকের উপর উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, সম্মুখে কলনাদিনী নদী, পার্শ্বে ও পশ্চাতে নানা-বিধ উদ্ভিজ্জ বস্তু, ফল, ফুল, বৃক্ষ, লতা, পাতা ইত্যাদি। এ সমুদয়ই তাঁহার মনোতুষ্টির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই সকলের মধ্যে কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। অনেক-ক্ষণ পরে চন্দনী স্থির হইলেন, অঞ্চল দ্বারা ঘর্ম্ম জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা দর্শন করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করি-লেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে অনশনা চন্দনী কখন যে নিদ্রাতুরা হইয়া নদীতীরে ঢলিয়া পড়িলেন তাহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন তিনি একটী কুসুমিত বনে দূর্ব্বা আস্তরণের উপরে শায়িতা রহিয়াছেন।

নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্রই চন্দনী উঠিয়া বসিলেন। এ স্থান যে তাঁহার অপরিচিত নহে, যে কুসুমিত বনের মধ্যে দেবদত্ত লুক্কায়িত ছিলেন এবং যে বনের মধ্যে দেবদত্ত দুই জনের শব দেহ ও শব-দেহ বহনকারীদিগকে দেখিয়াছিলেন এ সেই বন।

চন্দনী উঠিয়া বন হইতে বহির্গতা হইলেন। সম্মুখেই সেই চণ্ডদেবের গৃহ, তিনি যতদূর সম্ভব দ্রুতপাদ বিক্ষেপে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেন যে তিনি এরূপ ভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধিক ভাবিবার সময় অথবা শক্তি ছিল না। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া চণ্ডদেবের শয়ন কক্ষের সম্মুখে আসিলেন। চণ্ড-দেবের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল তদ্দর্শনে চন্দনী আশ্চার্য্যান্বিতা হইলেন। কারণ "ফকিরের ফন্দি" ও "মৃত ব্যক্তির বক্তৃতা"র পর সে কখনও দ্বার মুক্ত করিয়া শয়ন করে না।

সমস্ত দেহ আবরণ করিয়া চণ্ডদেব শয্যার উপর শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রাভি-

ভূত রহিয়াছে এ ঘটনাও চন্দনীর মনে আশ্চর্য্যের ভাব আনয়ন করিল, কারণ ইদানীং চণ্ডদেবের গাঢ় নিদ্রার অভাব দৃষ্ট হইত এবং সে দেহ বস্ত্রাবৃত করিতে ভাল বাসিত না।

চন্দনীর ইচ্ছা হইল চণ্ডদেবকে জাগাইয়া বাক্যালাপ করেন কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতার কক্ষে গমন করিলেন, তিনি কিন্তু সেখানে মাতাকে দেখিলেন না। একজন দ্বার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে গত কল্য নন্দকের সঙ্গে নন্দকের মাতা তাঁহার ও চণ্ডদেবের অনুসন্ধানে বহির্গতা হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডদেবও চন্দনীর মতই শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং চন্দনীর আগমনের অল্পক্ষণ অগ্রে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া নিদ্রাগত হইয়াছে।

তখন চন্দনী বুঝিতে পারিলেন যে চণ্ডদেবও তাঁহার মতন শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিল এবং তাঁহার মত দৈব অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। গত রাত্রিতে নন্দক মাতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদেরই অনুসন্ধানার্থ বাহির হইয়াছে। তিনি তখন শত্রু কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলিত নিজ গৃহটী পুনরুদ্ধার করিতে বসিলেন এবং সে কার্য্য সংক্ষেপেই সমাধা করিয়া স্নান ও তৎপরে পানাহার পূর্ব্বক নিজ গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক গীতা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। সহসা চন্দনীর অধ্যয়ন কর্য্যে বাধা প্রদান করিয়া ৩০ জন লোক আসিয়া চন্দনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। চন্দনী তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। কারণ শৈশবাবধিই তিনি তাহাদিগকে দেখিতেছেন, তাহারা সকলেই চণ্ডদেবের বিশ্বস্ত ও প্রাচীন ভৃত্য ও গৃহ-রক্ষক।

তাহারা চন্দনীকে কহিল "কর্ত্তা আমাদিগকে কায হইতে কেন যে বরখাস্ত করিলেন তাহা কিছুই বুঝিলাম না।"

চন্দনী অতীব বিস্ময় সহকারে কহিলেন "তোমাদিগকে জবাব দিলেন তবে অতঃপর কে তাঁহার কায ও বাড়ী রক্ষা করিবে?"

তাহারা কহিল "তিনি নূতন লোক রাখিলেন।"

চন্দনী ভীতা ও চকিতা হইয়া চণ্ডদেবের নিকট যাইতে চাহিলেন। কিন্তু অনেক নূতন লোক চণ্ডদেবের নিকট আসিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাতে বিরত হইলেন, কিন্তু এই সব প্রাচীন ও বিশ্বস্ত লোকদিগকে চণ্ডদেব বরখাস্ত না করেন এইরূপ অনুরোধ করিয়া তাহার নিকট একখণ্ড পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। চন্দনীর চিঠির উত্তরে চণ্ডদেব এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল।

"আমি যে শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলাম তাহা তুমি জান। এই সব ঘটনায় আমি আমার পুরাতন সমুদয় লোকের উপরই বিশ্বাস হারাইয়াছি এবং ইহাদিগকে বিতাড়িত করায় এই প্রধান

কারণ। অতএব এ বিষয়ে তুমি আর অধিক অনুরোধ করিবে না এই আমার অনুরোধ।"

চন্দনী ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। আগন্তুকগণ চণ্ডদেবের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদ।

১। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে। এতদিন গুজরাট হইতে বোম্বাইয়ে গবাদির ঘাস, খড় চালান হইত। এক্ষণে গুজরাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে উহা পাঠান হইতেছে।

২। বরোদা গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সূত্র পাতেই প্রজা সমূহের প্রাণ রক্ষার্থ যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। বরোদা রাজ্যের আম্‌বেলি নামক স্থানের রাজস্ব সচীব প্রজাদের অন্নক্লেশ দূর করিবার জন্য সরকার হইতে ৬০ হাজার টাকা প্রার্থনা করিয়াছেন। সরকার হইতে আহার্য্য দ্রব্য সকল সস্তাদরে বিক্রয়ের নিমিত্ত অনেকগুলি দোকান খুলিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। বরোদা ষ্টেট বোম্বাই হইতে ৬০ হাজার টাকার খড় কিনিয়া রাখিয়াছেন। বরদা রাজ রাজ্যের গৃহ পালিত পশুগুলিকেও অনাহারে মরিতে দিবেন না।

৩। বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাট স্যার চার্লস বেলি মহোদয় ১৯শে নবেম্বর স্যার এডওয়ার্ড গেইটকে তাঁহার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

৪। কলিকাতার পাটের কলে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে থলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। গত মাসে ৫ কোটী ৮৩ লক্ষ থলিয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ইহার অর্দ্ধেকও প্রেরিত হয় নাই।

৫। মিঃ কেয়ার হার্ডি।—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা কেয়ার হার্ডির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবাসিদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবাসিদিগের পক্ষ হইয়া অনেক প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করিতেন। ১৯০৭ সনে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় জননায়কগণের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক গরীব সূত্রধরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দুই জনেই স্কচ। ১৮৫৬ সনের ১৫ই আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লেবার-লিডার নামক এক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীন শ্রমজীবী দলের নেতা ছিলেন। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এই দলের মুখপাত্র হইয়া আন্দোলন করিতেন। এই স্বদেশ প্রেমিক, অক্লান্তকর্ম্মী, উদার-হৃদয় মহাত্মার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

৬। সুইজারল্যাণ্ডে আজকাল যে

ঘড়ির প্রচলন হইয়াছে তাহাতে কাঁটা নাই, একটী বোতাম টিপিলেই যখন যে সময় হইয়াছে তাহা মানুষের কথার ন্যায় বলিয়া দেয়।

গৃহকর্ম্ম।

পেস্তা ও বাদামের মোহনভোগ। দ্রব্যের পরিমাণ—পেস্তা ও বাদাম বাটা এক পোয়া, চিনি দেড় পোয়া, ঘৃত দেড় পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী—পেস্তা ও বাদাম পরিষ্কার সিলে ভাল করিয়া বাটিয়া লইয়া চিনির একতার বন্ধ রসে পেস্তা ও বাদাম বাটা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিয়া পুনরায় হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। খুব ঘন কাইয়ের মত হইয়া আসিলে অল্প একটু কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া নামিয়া রাখ। তাহা হইলেই পেস্তা বা বাদামের মোহন ভোগ প্রস্তুত হইল।

মুগের বরফি।

দ্রব্যের পরিমাণ—মুগ বাটা এক সের, ঘৃত তিন পোয়া, চিনির রস একসের, জাফরাণ আট আনা, ধনে বাটা আধ ভরি, মরীচ গুড়া এক তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকে ফেনাইয়া সারা করিবে পরে ঐ ঘৃতের সহিত মুগ বাটা, ধনে বাটা, মরীচ গুঁড়া ও জাফরাণ মিশাইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ মুগকে অল্প জ্বালে ভাজিয়া লাল করিয়া লইবে। পরে সাড়ে তিনতার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া নামাইয়া নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে সাদা হইলে ঐ ভাজা মুগ তাহাতে দিয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া কানা উঁচু থালে ঢালিয়া রাখিবে। অল্প শুষ্ক হইয়া আসিলে ছুরী দ্বারা বরফির আকারে কাটিয়া লইবে।

আদার মোহনভোগ।

দ্রব্যের পরিমাণ—এক সের আদা, আধ সের ঘৃত, চিনি দেড় সের, ময়দা এক ছটাক।

প্রস্তুত প্রণালী—আদা ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া লইবে। পরে আদা-বাটার সহিত ময়দা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া এক তার বন্ধ চিনির রসে মৃদু আলে পাক করিলেই উৎকৃষ্ট মোহনভোগ প্রস্তুত হইবে। গুরুতর আহারের পর ইহা অতি সুপথ্য। পূর্ব্বদিন গুরু আহার হেতু পেট ভারি থাকিলে ও দাস্ত খোলসা না হইলে এই মোহন ভোগ আধ ছটাক খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়।

[ডিমের জিলাপী।

দ্রব্যের পরিমাণ হংসডিম্ব বারটা, ঘৃত দুই ছটাক, চিনির রস দেড় পোয়া,

লেবুর রস একপোয়া, লবণ এক আনা, জাফরাণ এক আনা, দারুচিনি দুই আনা, ছোট এলাইচ চূর্ণ দুই আনা, লবঙ্গ চূর্ণ দুই আনা।

প্রস্তুত প্রণালী—অগ্রে লেবুর রসের সহিত চিনির দুইতার বদ্ধ রস প্রস্তুত করিবে। রস উনানে থাকিতে থাকিতে ডিম্বের ছরিদ্রাংশ বাহির করিয়া তাহাতে লবণ ও মসলা মিলাইয়া হস্ত দ্বারা খুব খাটিবে। তৎপরে রস উনান হইতে নামাইয়া ঘৃত উনানে চড়াইবে, ঘৃতপাক হইলে ঐ প্রস্তুত ডিম্ব একখানি মোটা নেকড়ায় ঢালিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া তাহার তলায় অল্প একটু ফুটা করিয়া গরম ঘৃতে জিলাপীর আকারে ছাড়িবে। বেশ লাল মত ভাজা হইলে পূর্ব্ব প্রস্তুত গরম রসে ছাড়িবে। অধিক ভাজা হইলে চুইয়া যাইবে সুতরাং সাবধান হইয়া ভাজিবে।

বামারচনা।

তাজমহল।

প্রেমের গৌরব স্মৃতি তুমি এই ভূমণ্ডলে।
মহিয়সী সমতাজে ধরি চারু বক্ষস্থলে॥
পত্নীর সম্মান তরে বাদশাহ সাজাহান।
অপূর্ব্ব গঠনে তোমায় করেছে নিরমান॥
পৃথিবীর নরনারী নিরখি বিস্মিত হয়।
এ শিল্প প্রণালী যেন ইহ জগতের নয়॥
ধন্য সাজাহান তব পত্নী-প্রেম চমৎকার।
রাখিলে অক্ষয়কীর্ত্তি ভরিয়ে সংসার॥
অদম্য উৎসাহে ভরে অজস্র অর্থের ব্যয়ে।
এ হেন প্রণয় স্মৃতি রাখেছ যে জাগাইয়ে॥
পরলোক হ'তে তব প্রেমময়ী মমতাজ।
না জানি কি প্রীতি নেত্রে নিরখিছে তোমা আজ॥
ধন্য সেই গরীয়সী মহিলা জগৎমাঝ।
ধন্য পত্নী পরায়ণ! তুমি গো যবনরাজ॥
পবিত্র প্রেমের তার গতি হেন প্রতিদান।
শ্রেষ্ঠ নারীকুল মাঝে লভিলা নব আসন॥
সাজাহান সম প্রেমে সমগ্র ধরণীতলে।
ধরি যত নর সবে পবিত্র স্মৃতির বলে॥
নিজেরে করিয়ে ধন্য তাহারেও ধন্য করে।
পরলোকগতা সেই অর্দ্ধ অঙ্গ ভাগিনীরে॥

জীবন সমস্যা।

দুটী আত্মা দুই স্থানে,
পরস্পরে নাহি জানে;
একীকৃত এ জীবনে,
শুভ প্রেম সম্মিলনে।
কেবা করে এ মিলন,
কোথা হ'তে এ বন্ধন?

আকাঙ্ক্ষা।

খুলি হৃদয়ের দ্বার অনন্ত সৌন্দর্য্য সার
অধিষ্ঠিত যে দেবতা অন্তর মাঝার।
নিন্দি চারু কোকনদ তাঁহার যুগল পদ
ভাসাতে মানসে মম সাধ অনিবার॥
সতত বাসনা জাগে প্রেম ভক্তি অনুরাগে
দিবানিশি ধরি সেই অমল চরণ।
মানস মন্দিরে রাখি সতত জুড়াই আঁখি
উপাস্য দেবতা মম সুন্দর গঠন॥
সুশীতল করি চিত্ত নেহারি তাঁহারে নিত্য
প্রেম অনুরাগে দীপ্ত অতুল আনন।
আমি যে গো জ্ঞানহীনা পাপ তাপে বিমলিনা
তথাপি হৃদয়ে কেন বাসনা এমন॥
যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগে তাঁহারে আঁখির আগে
জীবনে মরণে মম করিতে দর্শন।
হে বাসনা পূর্ণকারী হৃদয় বিহারী হরি
পুরাও গো! অধিনীর এই আকিঞ্চন॥
শুধু দরশনে চিত্ত নাহি হয় পরিতৃপ্ত
রমণী হৃদয়ে প্রভু অনন্ত পিপাসা।
পরাণে মিশাতে চাহে আপনাতে
ঘরে হৃদি তলে এ কেন দুরাশা॥
দাও হৃদয়েতে বল নারী জনম সফল
হয় যেন দয়াময় তোমার কৃপাতে।
পতিরূপে বিশ্বভূপে লভি যেন পূর্ণরূপে
এই নিবেদন প্রভু করি চরণেতে॥
লভি সে পরশমণি সম রাজ রাজেন্দ্রানী
উজলিয়ে রাখি মানস-মনিতে।
শূন্য নাহি হয় যেন এই হৃদি সিংহাসন
পরিপূর্ণ করি সদা তোমার প্রেমেতে॥
জীবন কুসুম মম প্রফুল্ল মন্দার সম
না ঝরে ফুটিয়া থাকে এ হৃদি মরুতে।
লাগিয়া ধরার বায় যেন ম্লান নাহি হয়
তব স্নেহ ছায়াদানে কর প্রস্ফুটিত॥

মঙ্গলালয়!

যাহা কর তুমি মঙ্গলেরি তরে,
হে মঙ্গলালয়, এ ধরার পরে
ফোটে ফুল পুনঃ ঝরে বসুধায়
কেবা জানে কেন তোমারি ইচ্ছায়
জাগে রবি, তারা আঁধার ঘনায়,
নিদাঘের পর ঘন বরিষায়
ভরি দাও তুমি ধরণীর বুকে
রাখ পাশাপাশি সুখ আর দুঃখে!
নহে ব্যর্থ তাহা নহে অর্থহীন
ফুটাও, আঁধারে আলোক নবীন
মরণের মাঝে সাজাও অমৃত
মানবের সখা, মানবে বিস্মৃত
হও নাকো কভু রাখ বুকে বুকে
জীবনে মরণে, শোকে দুঃখে সুখে!

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য।

ত্রিপারী শঙ্কর ভ্রমি চরাচর
অন্ন বিনা অনাহারে।
যেই অন্নদান পানে হ'লে ধন্য
জগন্মাতার করে॥
সেই অন্ন-বারি পরিপূর্ণা করি,
সদা এ জগত মাঝে।
রক্ষি নিজগুণে অন্নপূর্ণা সনে
সতত কর বিরাজ॥
সতীর পাশান্ত রাখিতে অক্ষুন্ন
ছের আজি কিবা প্রভু পরমেশ।
অন্নদা নিকটে যাচি করপুটে
ধরি অকপটে ভিক্ষুকের বেশ॥
সরম সম্ভ্রম অবলীলা ক্রমে
করি পরিহার আনন্দিত মনে।
ভিক্ষালব্ধ ধনে পরিতৃপ্ত প্রাণে
ধরিয়া যে শোভা করুণ নয়নে॥
বসুধা মাঝার হইল প্রচার
যে অপার কৃপা করুণার বলে।
কভু কদাচিত সে কৃপা বঞ্চিত
নাহি করি হীন পাতকী নরে।
ওই উদারতা ও উচ্চ প্রাণতা
করি শিক্ষাদান বিশ্ব চরাচরে॥

অপরাধী।

ওগো প্রভু! ওগো প্রিয়তম! হে মহান
দেবতা আমার!
নিরন্তর অপরাধী দাসী মার্জ্জনা নাহিক
জানি তার।
জানিয়া শুনিয়া করি পাপ না করিলে
চলেনা ভাবিয়া,
তোমার প্রীতিও ভাবে নাথ! এলোভনে
মজি'ছে এ হিয়া।
কে রাখে এ দারুণ সংগ্রামে রক্ষা কর্ত্তা
কেবা আছে আর
তোমা বিনা হে মহা সম্রাট! বন্ধুহীন
বিপুল সংসার!
কোন দিন করি নাই নাথ! তোমার
আদেশ মত কাজ,
বিপদে তোমারে ডাকিতেছি মনে মনে এই
বড় লাজ।
কোন কিছু পারি না করিতে তোমায়
প্রীতির অনুষ্ঠান,
অথচ পাইনি তোমা, ব'লে দিবানিশি
করি অভিমান।
তুমি যে বিশ্বের অধিপতি, তব যোগ্য কি
আছে আমার,
অর্চ্চনা করিতে পদযুগে প্রদানিতে পূজা
উপচার।
করিনি কিছুই তব তরে অনায়াসে শুধু
চাই,
অজ্ঞানকৃত এ পাপ দাসীর জন্মে জন্মে এর
ক্ষমা নাই।

শ্রী—স।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 630. February 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩০ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩২২। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গান।

১

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দাও,
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার দুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা
ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে
অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান,
তারে আনন্দের এই জাগরণী
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার দুইয়ে দাও।

২

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্য তারা দলে দলে।
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগনতলে।
তৃণের সারি তুলচে মাথা
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,

আলোয়-ভরা দেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।
সকাল বেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?

৩

অন্ধকারের উৎস হতে
উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে
জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে
রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে
রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে
অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি
বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে
ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে
লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

৪

মেঘ বলেছে যাব যাব;
রাত বলেছে যাই;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি তো আর নাই।
দুঃখ বলে রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।
ভুবন বলে তোমার তরে
আছে বরণ-মালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে সে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিরাতার্জ্জুনীয়।

(মহাকবি ভারবি-বিরচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যাবলম্বনে)

প্রথম সর্গ।

সুনিবিড় শ্যামশোভা দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির
করেন বসতি ;
আসিল সকাশে তাঁর ব্রহ্মচারি-বেশে দূত
কিরাত সুমতি ;
পাণ্ডব-আদেশে যিনি বিচরি হস্তিনাপুরে
কুরুরাজধানী,
বিদিত কৌরবপতি কোন্ নীতি অনুসরি
পালিছে অবনী।

সম্ভ্রমে প্রণাম করি বসিয়া বিহিতাসনে,
বর্ণনে বাসনা,
কি ভাবে দুর্হৃদশ্রেষ্ঠ রক্ষিতে বিজিত মহী
করিছে সাধনা ;
যদ্যপি অপ্রিয় বাণী, তথাপি হৃদয় তার
নহেক কাতর,
তোষে না হিতৈষী কভু অমৃতমধুরভাষে
প্রভুর অন্তর।

একান্তে আসীন দোঁহে ; শত্রুজয়-অভিলাষী-
অধিপ-আজ্ঞায়,
বিজ্ঞাপিল বনেচর বিশেষ সৌষ্ঠবশালী
গম্ভীর ভাষায় ;
বহুক্লেশে ছদ্মবেশে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে
নিশ্চিত প্রমাণ,
যে সমূহ তথ্যরাজি নিবেদি সকল প্রভো,
কর অবধান।

গুপ্তচর-চক্ষু-বলে করেন নৃপতিগণ
সতত দর্শন
নিয়োজিত প্রতিনিধি সমুচিত নহে কভু
বঞ্চনা, রাজন্ ;
ক্ষমা কোরো সেই হেতু সাধু বা অসাধু যদি
সন্দেশ আমার ;
দুর্লভ ধরণীতলে মনোজ্ঞ কল্যাণকর
বচন-সম্ভার।

হিত উপদেশ যেবা না দেয় প্রভুরে কভু
দুর্ম্মন্ত্রী যেজন,
দুষ্ট প্রভু নাহি শোনে অমাত্যের হিতকর
অপ্রিয় ভাষণ ;
অমাত্য-অধিপ যেথা গ্রথিত প্রীতির সূত্রে,
অন্যোন্যসহায়,
অকপট অনুরাগে অচলা চঞ্চলা সদা
বিরাজে তথায়।

নিসর্গ দুর্গের কোথা কূটনীতি-পরায়ণ
নৃপতি-আচার ;
বিচার শকতিহীন অবোধ বিকলমতি
কোথা বা আমার,
তথাপি নিগূঢ়তত্ত্ব অরাতির রাজতন্ত্র
বিদিত যে আমি
সম্ভাবিত আজি তাহা অপূর্ব্ব প্রভাবে তব
হে জীবনস্বামি,

সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুযোধন,
তথাপি তাহার
বনবাসী পাণ্ডবের প্রতাপে শঙ্কিত হৃদি,
সদা গুরুভার ;
সুবিশাল রাজ্য তব হেলায় অর্জ্জন করি
দুরোদরচ্ছলে,
শাসিতে সচেষ্ট আজি সমগ্র ধরণীতল
সূক্ষ্ম নীতিবলে।

সদ্গুণ সম্পদে তব সুনির্ম্মল যশোভাতি
আবরণ-আশে
আজন্ম কুটিলমতি, তথাপি ভাস্বরজ্যোতি
মহিমা প্রকাশে ;
অনার্য্য-সঙ্গমে যত হৃদয়ের উচ্চভাব
পায় যে বিলয়,
উদার চরিত্রসনে বিরোধেও মানবের
মহত্ত্ব-উদয়।

অদম্য উৎসাহ-বলে বিদলি অন্তর-রিপু
মহাদুর্নিবার,
দিবানিশি অতন্দ্রিত সুনীতিসহায়ে করে
পৌরুষ বিস্তার ;
মনুর পদাঙ্ক-লেখা অনুসরি মহোল্লাসে
অতীব দুর্লভ
সিদ্ধিলাভ-বাসনায় পালিছে প্রকৃতিপুঞ্জ
বর্দ্ধিতগৌরব।

অনুজীবিগণে সদা প্রীতিমান্ মিত্র-সম
স্নেহ ব্যবহার ;
হিতৈষী সুহৃদ্গণে আত্মীয় কুটুম্ব-সম
মধুর সৎকার ;
স্বজন-সকাশে পুনঃ বিনয়-বিনম্রভাব
যেন বা অধীন ;
নাহি সে পূর্ব্বের গর্ব্ব, এবে রাজা অহঙ্কার-
লেশ মাত্রহীন।

ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনে রত
অসক্ত অন্তর ;
নাহি কোনো পক্ষপাত, যথোচিত ভক্তি-
ভরে সেবে নিরন্তর ;
গুণ-অনুরাগে যেন নিত্যভাবে অবস্থিত
হৃদয়ে তাহার,
পরস্পরে নাহি বাধা, সমান প্রভুত্ব সবে
করিছে বিস্তার।

নহে দানবিরহিত সম্রাটের অমায়িক
প্রিয় সম্ভাষণ ;
সমাদর-বিবর্জ্জিত নহে কভু প্রভুত সে
ধন-বিতরণ ;
সদ্গুণ সম্পদ বিনা প্লাবি তাঁর হৃদিতট
বহে না উচ্ছল
সুবিমল প্রীতিধারা, স্নিগ্ধ করি সুজনের
অন্তর বিহ্বল।

মহীপাল-ধর্ম্ম সদা দুষ্ট-নিপীড়ন আর
শিষ্টের পালন,
ক্রোধে কিম্বা ধনলোভে বিনা দোষে কভু
কারো না হয় শাসন ;
প্রধান বিচারপতি-উপদিষ্ট দণ্ডদানে
সতত তৎপর,
অধর্ম্ম দমনে তাঁর অরাতিস্বজনে নাহি
ভেদ আচরণ।

নিয়োজিত নিরন্তর বিশ্বাসী রক্ষক কত
স্বপর মণ্ডলে,
শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর সুশীতল শান্তিসুধা
ঢালে সুকৌশলে;
কর্ম্মশেষে নরপতি বিপুল বিভবরাশি
দেন পুরস্কার,
কৃতজ্ঞতা কভু নাহি প্রকাশে কেবল মাত্র
প্রিয়বাক্য তাঁর।

সুবুদ্ধি-সহায়ে সদা সুবিহিত শত্রুমাঝে
উপায় সকল,
সুবিশাল রাজ্যে তাঁর নাহিক কোরব-
দ্বেষী বিদ্রোহী প্রবল;
সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ কুফল প্রসব কভু
করে না তাঁহার,
ঐশ্বর্য্য প্রভাবে যেন বর্দ্ধিত করিছে নিত্য
কল্যাণ-সম্ভার।

প্রভিন্ন বারণ কত উপহার দেয় তাঁরে
নৃপতিমণ্ডল,
সপ্তপর্ণদল-সম বিতরি মধুর গন্ধ
ক্ষরে মদজল;
রাজন্যনিকর-রথ-তুরঙ্গ-সঙ্কুল সভা-
মন্দির-প্রাঙ্গণ,
পরিষিক্ত গজমদে সতত সুবাসে তোষে
পারিষদ্‌গণ।

প্রজার মঙ্গলতরে হিতকর অনুষ্ঠানে
মুক্ত কোষাগার,
কৃষীবল জনপদে চাহে না সলিলধারা
ঘন বরষার;
উপজে বিবিধ শস্য অনায়াসে ক্ষেত্রে যেন
বিনা কৃষিবলে;
শ্যামল বসনে যেন বিরাজিতা কুরুলক্ষ্মী
সস্মিত-আননে।

সদয়, উদারকীর্ত্তি, নিয়ত নিপুণ হস্তে
প্রকৃতি-পালন;
শান্ত কত উপদ্রব, পদে পদে চতুর্দ্দিকে
গৌরব-লক্ষণ;
ধনপতিতুল্য তাঁর সদ্‌গুণ-প্রভাবে যেন
তরল-হৃদয়
মেদিনী দোহন করে, আপনি সন্তোষ
হেতু রতন নিচয়।

সমরে প্রথিতনামা অমিতবিক্রম কত
মহাধনুর্দ্ধর
সুজাত, সম্মানধন, পুরস্কৃত, রাজকার্য্যে
সমুদ্যত-কর;
পরস্পরে নাহি কভু সংহতি বিরোধ কোন
অশিবনিদান,
সতত বাঞ্ছিতলাভে সচেষ্ট সকলে রক্ষি
নৃপতির প্রাণ।

অভীষ্ট সাধনে কভু বিরাম নাহিক তাঁর
বিনা ফলোদয়,
সুজন প্রতিধিমুখে বিদিত নৃপতিবৃন্দ
ক্রিয়া সমুচ্চয়;
বিধাতার কার্য্য যথা গম্ভীর অবোধগম্য
প্রারম্ভ তাঁহার;
মহোদয় শুভঙ্কর সিদ্ধিলাভ বিনা নহে
উদ্দেশ্য-প্রচার।

সমুদ্যত নহে কভু কার্ম্মুক শিঞ্জিনীযুত
অরাতি-সন্ত্রাস,
চিরহাস্যময় সেই বদনে হয় না কভু
ক্রোধের প্রকাশ ;
সুরভি-সুন্দর পুষ্পে গ্রথিত মালিকা যথা
বহু গুণময়,
বহে তার সুশাসন আনন্দে আপন শিরে
নরপতিচয়।

নিয়োজিত দুঃশাসন যুবরাজপদে, দৃপ্ত
নবীন যৌবন ;
পুরোধার অনুমতি শিরোদেশে ধরি রাজা
অদম্য-শাসন,
বিশাল মণ্ডপ-মাঝে মহাযাগ-অনুষ্ঠানে
করেন বসতি
মাঙ্গলিক আজ্যদানে হিরণ্ময়েতসে তোষে
সমাহিতমতি।

আসমুদ্র ভূমণ্ডলে যদ্যপি প্রলীন যত
সপত্ন ভূপাল,
যদ্যপি গভীর শান্তি অকুণ্ঠ প্রতাপ-বলে
রাজে চিরকাল ;
তথাপি পাণ্ডবভীতি-জলদে আবৃত তাঁর
হৃদয়-গগন ;
বিরোধ প্রবলসনে সতত অশান্তিময়,
অহহা কি ভীষণ !

কথার প্রসঙ্গে যদি কেহ কভু তব নাম
করে উচ্চ রব,
অর্জ্জুনের তেজোরাশি স্মরিয়া দুঃসহ দুঃখে
আনত-আনন ;
ফণাধর সর্প যথা বিষবৈদ্য-উচ্চারিত
শুনি মন্ত্রধ্বনি,
তক্ষক বাসুকি নামে গারুড় বিক্রম স্মরি
আনত আপনি।

সমুদ্যত নরপতি করিতে কপট বলে
পাণ্ডব-বিলয়,
সমুচিত প্রতিকার বিধানে সত্বর দেব,
কর শত্রুজয় ;
তুমি দূর দূরান্তরে অন্য সহ আলাপনে
আনি সমাচার,
মন্ত্রণা-অপটু সদা আমাদের বাক্যাবলী
কথামাত্র সার।

সুধীরে কিরাতপতি নিবেদি সন্দেশ হেন
গম্ভীর বচনে,
সাদর সৎকার লভি চলিলা ত্বরিতপদে
কানন-ভবনে ;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সদনে গেলা
স্থির অচঞ্চল,
বলিলা অনুজগণে বনেচর-বিজ্ঞাপিত
বারতা সকল।

শুনিয়া অরাতিশ্রেষ্ঠ কৌরবপতির সেই
বিপুল গৌরব,
অপমান-নিপীড়িত দ্রুপদতনয়া-হৃদে
বিকার-উদ্ভব,
আযোড়িত মনোভাব নিরুদ্ধ করিতে
নারি সতীশিরোমণি,
সগর্ব্বে কহিলা বালা সঞ্চারিতে
রোষানল উদ্দীপনা বাণী।

সুবুদ্ধি পণ্ডিত তুমি রাজনীতিবিশারদ
আরাধ্য আমার,
ভয়াদৃশ জনে দেব, প্রমদা-নিয়োগ-বাণী
যেন তিরস্কার ;
তথাপি এ দীর্ঘকাল অসহ যন্ত্রণা আর
সহিতে না পারি
প্রকাশি হৃদয়ভাব অবলার সমুচিত
লজ্জা পরিহরি।

দুর্জ্জয় সুরেন্দ্র-সম বিখ্যাত ভরতকুলে
নৃপতি সকল
শতশত প্রতাপে সদা শাসিত অখণ্ড এই
অবনী-মণ্ডল ;
তুমি কিন্তু মহারাজ কুসুম-মালিকা যথা
প্রমত্ত বারণ
আপনার করে তুলি সুখভোগ্যা বসুন্ধরা
দিলে বিসর্জ্জন।

কপট-আচারি-মনে সেই জন নাহি করে
কপট আচার,
বিমূঢ় বিবেক বুদ্ধি, সুনিশ্চিত পরাভব,
কলঙ্ক তাহার ;
বর্ম্মহীন বীরদেহে সহজে প্রবেশে যথা
নিশিত সায়ক,
সরল ধার্ম্মিকমতি সুজনে আত্মীয় ছলে
বধে প্রবঞ্চক।

কোন্ রাজা তোমা বিনা উদগ্র ক্ষত্রিয়
বীর্য্য প্রবল সাধন,
ছদ্মবেশী বৈরি-করে অনুকূল কুললক্ষ্মী
করে সমর্পণ ?

শুনেছ কি কভু দেব কখনো কোথাও
কোনো কুলীন-সন্তান
সুন্দরীর শিরোমণি প্রণয়িণী কুলবধূ
অন্যে দেয় দান ?

নহে কভু সমুচিত মনস্বী বীরের কার্য্য
কপটে প্রশ্রয়,
সম্মুখ সমর ত্যজি প্রণত মস্তকে বহে
দৈন্য পরাজয় ;
কেমনে জ্বলে না বল উদ্দীপিত রোষানলে
হৃদয় তোমার ?
সমুজ্জ্বল বর্ত্তিশিখা পরিশুষ্ক শমীতরু
করে পরিহার ?

অবজ্ঞা যাহার ক্রোধ পরাঙ্মুখ নহে কভু
বৈরনির্য্যাতনে,
সুলভ গৌরব তার, প্রকম্পিত শত্রুগণ
লুটায় চরণে ;
পদে পদে অবজ্ঞাত কাতর ঐশ্বর্য্যহীন
ক্রোধশূন্য জন,
কিবাতে সৌহার্দ্দ্যে তার ? বিদ্বেষে নাহিক
কোন ভীতির কারণ।

চেয়ে দেখ মহারাজ, এই কি সে ভ্রাতা তব
বীর বৃকোদর,
আরক্ত-চন্দন-ভালে ভ্রমিত যে মহারথ
উল্লাস-অন্তর,
ভ্রমে আজি পদব্রজে ধূলিম্লান দেহকান্তি
পর্ব্বত কাননে,
তথাপি কি সত্যধন, আলস্যে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে ?

অই দেখ ধনঞ্জয়, একাকী উত্তরকুরু
করিয়া বিজয়
অধিবাসিগণে দিলা প্রভূত সুবর্ণরৌপ্য
রতন-নিচয়,
সেই সে বাসবোপম পরি আজ বল্কবাস
ভ্রমে বনে বনে।
তথাপি কি সত্যধন, আনন্দে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে?

অই দেখ মাদ্রীদেবী-যমজ তনয়যুগ
কুসুম-কোমল,
বনাস্তশয্যায় আজি কঠিন-আকৃতি-গ্রস্ত
বিশীর্ণ কুন্তল,
গিরিরাজ-তুল্য দেহ, বিস্তৃত লাবণ্যলীলা
মধুর আননে।
তথাপি কি সত্যধন, সন্তোষে কাটাবে
কাল, সুসংযত মনে?

বুঝিতে পারি না দেব, কিরূপ হৃদয়ভাব
সম্প্রতি তোমার।
জগৎ বৈষম্যময়, মানবের চিত্তবৃত্তি
বিচিত্র-প্রকার;
অনভ্যাসে বনবাসে দারুণ দুর্দ্দশা তব
হেরি নিরন্তর,
অহো কি বেদনাভরে সতত অন্তর মম
বিকল কাতর।

কোথা আজি মহারাজ, সুন্দর কোমল তব
অমূল্য শয়ন?
কোথায় বা সুনিপুণ বৈতালিক স্তুতি-
গীতি মঙ্গল-বোধন?
দুঃসহ কঠিনস্পর্শ বহুকুশ বনস্থলী
শয্যা সে তোমার
বিনিদ্র সতত শুনি অশিব বিকটশ্রুতি
শিবার চিৎকার।

তুষিতে যে প্রতিদিন সুখাদ্য আহার-দানে
সহস্র ব্রাহ্মণ,
রমণীয় কলেবর সর্ব্বশেষে পরিতোষে
করিয়া ভোজন,
অন্নের অভাব আজি অমিশ্র বন্যফল
ভক্ষ্য সে তোমার
পরিক্ষীণ দেহ, কান্তি; পরিশূন্য আজি
তব যশের ভাণ্ডার।

মণিময় পীঠতলে অবিরত সুখশায়ী
যে পদ-যুগল,
রঞ্জিত সতত যাহা শিরোমালা রজোরাগে
রাজেন্দ্রমণ্ডল,
কত না বেদনা পাও সেই সে চরণে
আজি বিচরি কাননে;
ভ্রমে যেথা বহুক্লেশে কুশাগ্রভেদনরত
মৃগ দ্বিজগণে।

আজি যে দুর্দ্দশা তব একমাত্র দুর্য্যোধন
কারণ তাহার;
তাই দেব অপমানে সমূলে উন্মূলিত যেন
মানস আমার;
অরাতির পরাক্রমে অকুণ্ঠিত বলবীর্য্য
অভিমানি জনে
বিপত্তি, উৎসব-সম, আহ্লাদিত করে
নব-উন্মাদনা-দানে।

কে না জানে এ জগতে অগ্রনেতা তুমি দেব,
তেজস্বি-সমাজে,
প্রতাপ-দুন্দুভি তব গম্ভীর-আরাবে সদা
চতুর্দ্দিকে বাজে ;
তুমি যদি যশোধন প্রণতমস্তকে সহ
হেন অপমান,
কে আর করিবে বল, গৌরবে ধরণীতলে
আশ্রয় প্রদান।

কি ফল বিক্রমে, যদি ক্ষমিতে কপটশত্রু
করেছ মনন ?
খুলে ফেল চিরতরে তূণীর কার্ম্মুক অসি
নৃপতি-লক্ষণ ;
জটাজূট শিরে ধরি নিঃস্পৃহ-অন্তরে থাক
তপস্বীর বেশে,
প্রজ্বলিত হোমানলে কর সুখে আত্মদান
মোক্ষলাভ-আশে।

কি ভাবিছ অরিন্দম, নাহি কোনো দোষ হেন
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে ;
কে কবে বিরত বল, কপটী বৈরীর সহ
শাঠ্য-আচরণে !
দুর্ব্বিসহ বীর্য্যবলে সতত বিজয়লক্ষ্মী
অঙ্কশায়ী যার,
সে কি কভু করে দেব, মায়াসন্ধিবিঘটনে
সত্যের বিচার ?

দুর্দ্দৈব রজনীশেষে প্রভাত-সূর্য্যের সম
বর্দ্ধিত শোভায়,
উঠ পুনঃ দীপ্ততেজে বিনাশি ঘনান্ধতম-
অরাতিনিকায় ;
বিপদ-বারিধি-গর্ভ জ্বলুক মহিমা মাখি'
গৌরবকিরণে,
লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি বিলসিত হউক্ তব
প্রফুল্ল বদনে।

ইতি কিরাতার্জ্জুনীয়ে মহাকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

আদেশ পালন।

(গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কনকের শিরায় শিরায় মত্ত আবেগের প্রখর তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া আকুল উন্মাদনায় ঝঞ্ঝুত হইতে লাগিল। কনক নির্জ্জীব পুতুলের মত স্থির।

অনেকক্ষণ পরে কাঁসর ঘণ্টার ঘন

ঘোর রোলে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সকলে প্রণতপ্রায় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবেশবিহ্বল কনক মুদিতচক্ষে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইল। দেখিল সেখানেও প্রেমের জ্যোতি-মণ্ডিত ভগবান বিঠোবার উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তি! সে কি চমৎকার! সদা উচ্ছ্বসিত আনন্দ-আবেগে অধীর কনক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, একাগ্র নিষ্ঠায় আপনাকে সংযত করিয়া সেই অন্তরদেবতাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রির কোলাহলমুখর জগৎ দূর দূরান্তের অন্ধকার-মধ্যে সসঙ্কোচে লুকিয়া পড়িয়া গেল। এ বিচ্ছিন্নতার মাঝে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! এখন মানুষের সহিত চোখোচোখী হইবার ভয় তাহার নাই! এখন তাহাকে বিচলিত করিবার কেহ নাই,—এখন সে তাহার দেবতার জন্য ছুটি পাইয়াছে, এখন সে নির্ভয়!

আরতি শেষ হইল। সকলে দেবোদ্দেশে মস্তক নত করিল। আত্মহারা কনকের মস্তক আকুল আবেগে একেবারে ঠিক যেন ইষ্টদেবতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল!

আবার ভজন আরম্ভ হইল, সকলে শুনিতে বসিল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেল, কনককেও ডাকিল, কনক শুনিল না, উঠিল না—বুঝি সে-শক্তি তখন তাহার ছিল না। তখন তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া—ভজন ছাড়িয়া; ঐ লোকালোক পারে, এক অজানা রাজ্যে বিহার করিতেছিল।

নান্‌কীর মা ভাবিল, কনক গানের নেশায় মাতিয়াছে, সে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে না; থাকুক ফিরিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া লইলেই হইবে। তাহারা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার কনককে ডাকিল, কনক তখনো বাহ্যজ্ঞানরহিত তন্ময় তদ্গত! হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইল, মুখের কাছে হেঁট হইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, বুঝা নান্‌কীর মা, আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিল! এতক্ষণে তাহার চৈতন্য ফিরিল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুপ্তোত্থিতের মত বিস্মৃত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"মন্দির প্রদক্ষিণ!"

"ওমা আমরা যে এই প্রদক্ষিণ করে এলুম।" "তোমরা প্রদক্ষিণ করেছ? আচ্ছা থাক, আমি শীগ্‌গির প্রদক্ষিণ করে আস্‌ছি।"

কি হাঁদা মেয়ে! তাহারা যখন ডাকিল তখন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর এখন একলা চলিল! নান্‌কীর মা বলিল, "তবে প্রদক্ষিণ করে এস, আমরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর একবার ঘুরে যাই—" নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া ভিতরে চলিল।

কনক বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কয়বার প্রদক্ষিণ হয় হইল তাহার হুঁস নাই, কনক আপন মনে মন্দির ছাড়িয়া, রাস্তা ধরিয়া একলাই

লোকের ভয়ে চলিল,। নান্‌কীর মার কথা তাহার মনেই নাই।

সোজা রাস্তা। বরাবর মাঠের রাস্তা পার হইয়া আসিয়া কনক গ্রাম্য পথ ধরিল; সে যে কতখানি রাস্তা পার হইয়া এখন কোন্ খানে আসিয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আপন মনেই চলিয়াছে। গভীর তন্ময়তায় সে একেবারে মুহ্যমান!

বিস্তৃত প্রান্তরে, আলোর উপর আলো ঢালিয়া পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে হাসিতেছিল; কনক এতক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া, নিজের ছায়া পিছনে ফেলিয়া, বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। এখন সহসা গ্রাম্য পথে উঠিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখা-পত্রান্তরালবিচ্যুত, খণ্ড বিভক্ত, অস্পষ্ট আলো দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাইত, আসিয়াছে কোথা! এরই মধ্যে এতখানি!

সঙ্গীরা কোথা? কনক পিছন দিকে চাহিল, কেহ নাই! নির্জ্জন পথে সে শুধু একাকী!—কনক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাইত নান্‌কীর মা যে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিল। তবে কি তাহারা নাই! না তাহাকে একলা ফেলিয়া তো তাহারা যাইবে না!

কনক সাম্‌নের রাস্তার দিকে চাহিল, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে। কনক উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল, "কে গা?"

বিধাতার বিড়ম্বনা! হঠাৎ সেই অস্ফুট অন্ধকার ভেদ করিয়া—উদ্দামচাঞ্চল্যভরা পবনের মত ছুটিয়া আসিয়া লোকটা সবলে কনকের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল এবং আবেগবিকম্পিত-কণ্ঠে স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "কনু কনু তুমি—"

যুগপৎ সংঘটিত বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার উপর্য্যুপরি সংঘাতে কনক প্রথমটা হতভম্ব! তাহার পর অকস্মাৎ সবেগে এক ঝাপ্টা দিয়া সেই লোকটার কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, ত্রস্ত কুরঙ্গিনীর মত লঘু লম্ফে, নিমেষ-মধ্যে পশ্চাতে হটিল; এবং বজ্রকঠোর স্বরে ডাকিল, "ভাইলাল!"

"হাঁ কনু, ভয় নাই, আমি ভাইলাল, আমি,——আমি তোমায় বড়——"

তীব্র কঠোর ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "আবার—আবার প্রবঞ্চনা! কৃতঘ্ন ধূর্ত্ত, আবার ফের!—সরে দাঁড়াও!"

পিছু হটিয়া কাতরকণ্ঠে ভাইলাল বলিল, "না মা কনু ছলনা নয়, আমি যথার্থই বল্‌ছি, কিন্তু কি করে তোমায় বোঝাবো? কনু, কি বিপদেই আমি পড়েছি! ক্ষমতাশীলের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্য এরকম গর্হিত কাজে—জেনে শুনে পাপে ডুবে আছি, ক্ষমা কর কনু ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর—তার পর আমি তোমারি—" না না ও দুর্ব্বলতার গ্লানি আর নয়, মানুষ মানুষের আত্মীয়তা-প্রয়াসী!—ভুল!

চক্ষের জল, কণ্ঠের কাতরতা, ওসব তো দৃশ্য অভিনয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন! সেও তো এতদিন অপরিসীম ব্যাকুলতায় ঐ ব্যর্থতার পশ্চাতে যথেষ্ট খাটিয়াছে, তবে তবে...! নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী হাসি কনকের অধরে ফুটিয়া উঠিল।—"ভাইলাল, তুমি শুধু নরাধম নও, তুমি মহা অপদার্থ! কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ভাইলাল, আমায় আর প্রলোভনে লুব্ধ কর্‌তে পার্‌বে না, যা হবার তা হয়েচে; কিন্তু তবুও বল্‌চি, উপরদিকে চাও,—এ জীবনের পরেও জীবন আছে, মৃত্যুর পরও মৃত্যু আছে, এখনো ফেরো, এখনো আপনাকে সামলাও।"

কনক দ্রুতবেগে চলিয়া গেল!

কুলিশনির্ঘোষে জলন্ত জ্বালাময়ী কঠোর আদেশ! বজ্রাহতপ্রায় ভাইলাল স্তব্ধ হতবুদ্ধি!

৫

তাহার দিনকয়েক পরেই একদিন পঞ্চায়েত-শক্তির প্রবল উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতভাগা ভাইলাল দেশ ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার হঠাৎ নিরুদ্দেশের হুজুক লইয়া গ্রামে দিন কতক খুব আন্দোলন চলিল, কারণ পরিস্ফুট না হইলেও——মাতব্বর লোকেরা নিজেদের তীক্ষ্ণধার কল্পনা-শক্তির সাহায্যে চোখ টেপাটেপী করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন.....।

কনক সকলই শুনিল; সে গভীর আশ্বস্ত-ভাবে বিঠোবার চরণোদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তোমার অনন্ত করুণা প্রভু!

দিনকয়েকের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, প্রভু রাওয়ের কন্যা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবান বিঠোবাদেবের মন্দিরে সেবাব্রত-ধারিণী হইবে। সকলে অবাক!—কথাটা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল, কেহ বলিল দুর্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল নির্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল...।

প্রভু রাওএর পরিবারবর্গ কিন্তু নিস্তব্ধ; প্রভুত্তর-প্রত্যাশী বিজ্ঞের দল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন।

তারপর সত্যসত্যই এক উজ্জ্বল প্রভাতে ততোধিক পুণ্যোজ্জ্বল বেশে—গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কনক, দেবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া পল্লী ছাড়িয়া, আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া, বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইল।

৬

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। পৃথিবীর কাজ যেমনকার তেমনই চলিতেছে, অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত-কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, এবং পঞ্চায়েত বদল হইয়াছে। প্রভু রাওএর পরিবার আগের মতই আছে; ভাইলাল আজো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রাতঃকাল। সদ্যস্নাতা গৈরিকধারিণী, সতীত্ব-লাবণ্য-উদ্ভাসিতা, পুণ্য-গৌরবে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মচারিণী কনক বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ফুলবাগানে দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সমস্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়া কনক পরিপূর্ণ শোভা সুন্দর সাজির পানে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। সে কবে এমনি ভাবে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া এমনি করিয়া সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হৃদয়-দেবতার চরণে পরিপূর্ণ অনবদ্যে দান করিয়া নিজের কাছে মুক্ত হইবে!

মানবে যে মহত্ত্বের মূল্য বোঝে না, যে চ্যুত পুষ্পার্ঘ্য তাহারা চরণে দলিয়া যায়, সেই অনাদৃত দান,—বড় অভিমানে বড় বেদনায় সে দেবতার দ্বারে বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখানেও যেন কি অব্যক্ত দ্বিধা জাগিতেছে। এ ভুল কেন ভগবান!—এ ভ্রান্তি সংহার কর, এ দানের সঙ্গে সে দানের পার্থক্য আকাশ পাতাল! সে ছিল উগ্র-শক্তি সুরা, আর এ যে পিষ্ট হৃদয়ের সার—সুধা! এ যে সন্তাপের আগুনে শোধন করিয়া লইয়াছে,—এ হৃদয়-শতদলের স্নিগ্ধ পরিমল-সম্ভার, এ শুধু তোমার!—সারা পৃথিবীর মধ্যে—জীবনের শেষের দান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লইয়া ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে, ওগো ভগবান, ইহার অধিকারী শুধু তুমিই! তবে কেন এখনো এ ব্যবধান, কেন এখনো এ কুণ্ঠা!

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা তুলিয়া কনক মন্দিরের পানে, বিহ্বল-বিস্ফারিত-নয়নে একবার তাকাইল! সহসা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

ফুলের সাজি-হস্তে কনক মন্দিরের সোপানের উপর আসিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ দেবমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের উপর তাহার মাথা লুটাইয়া পড়িল। ভগবান, যদি দয়া করিয়া দুঃস্বপ্ন হইতে জাগাইয়াছ, তবে আবার কেন মাঝে মাঝে তার মোহময় স্মৃতিলোকের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাও ঠাকুর! যদি দয়া করিয়াছ, তবে আরো কর, একেবারে ছুটি দাও, সত্যকার মুক্তি দাও!—ত্যাগের মধ্যে জয়ের সন্ধানে চলিয়াছি ভগবান, জয় দাও—পরাজয়ের গ্লানি মোচন কর!"

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের পরিচারিকা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। পদ-শব্দে মাথা তুলিয়া কনক চাহিল, পরিচারিকা দেখিল, তাহার চক্ষে গভীর ঘুমের গাঢ় আবেশ!

"মা শুনেছ গা আহা কোথাকার কে ভিন্ দেশী অচেনা লোক, একলা এসে বিঠোবে প্রাণটা হারালে বাছা!—"

কনক জিজ্ঞাসা করিল, "কে মা?"

"ঐ উত্তরদিকের মাঠে একটা লোক ওলাউঠায় মর-মর হয়ে পড়ে আছে, সঙ্গে এক প্রাণীও নেই, শুনছি নাকি বিঠোবা

দর্শনে আসছিল তার পর এই ব্যবস্থা। বিঠ্ঠল, কার মাটি কোথায় কেনা তা তুমিই জানো।

কনক ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সঙ্গে কেউ নেই?"

"হাঁ গো মা, আহা নিছক একলা!"

"বিঠোবার সেবাইত কেউ গেছে কি না?"

"এখনো কেউ খবর পায় নি, আমি এইমাত্র শুনে আসছি।"

কনক লাজিসুদ্ধ ফুল রাখিয়া, মনে মনে বিঠোবাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুষের কাজের আগে দেবতার কাজ! চক্ষের সামনে এমন পূজার আয়োজন থাকিতে চক্ষু মুদিয়া অর্চ্চনার চেষ্টা আজ নিষ্ফল! দেবতা অন্ধ তোষামোদে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তাঁহার কাছে সাধনার পুরাপুরি মূল্য দিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়! সকল দিকে।

কনক তখনি দুইজন সেবাইতকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে চলিল। আর এক ব্যক্তি চিকিৎসক আনিতে ছুটিল। তখনকার দিনে বিঠোবার সেবাইতদিগের নিকট অনাথ আতুরগণ সকল সময়ে সাহায্য পাইত।

তাহারা গিয়া দেখিল, প্রান্তর-মধ্যে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রোগের অবস্থা তখন অতি ভয়ানক, রোগীর চোখে ঘোলা পড়িয়াছে, কানে তালা ধরিয়াছে, হাতে-পায়ে আক্ষেপ হইতেছে, পেটের দারুণ যন্ত্রণায় হতভাগা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সংক্রামক রোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিয়া কয়েকজন হুজুকবাজ নিষ্কর্ম্মা, দয়াপরবশ হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। রোগী জ্ঞানসঞ্চারে মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছে, "জল জল— ওগো একটু জল!"

রোগীর মুখপানে চাহিয়া কনক স্তব্ধ হইয়া গেল। হাঁটু পাতিয়া নীচু হইয়া জন্মের মত, জীবনের মত—যেন ইহপর-কালের মত সন্দেহ মিটাইয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর তাহার পর বেদনাজড়িত অস্ফুট উচ্চারণে, কাতরস্বরে বলিল, "একি প্রভু একি! একি হৃদয়বিদারক প্রলয়ঙ্কর রহস্য!"

মুমূর্ষু ব্যক্তি ভাইলাল! কনক ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চক্ষু মুদিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে, অন্তরের অন্তর হইতে নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া দেবতার চরণ-উদ্দেশে ছুটিল। সে ভাষা শব্দহীন, সে ভাব অনুভবের অতীত।

সামান্ত মেঘের ঘোর কাটাইতে বিশ্ব-গ্রাসী ঝড়ের আয়োজন! দর্পণের প্রতিবিম্ব মুছিতে দর্পণই চূর্ণ করিবার আদেশ! কি অদ্ভুত! ইহাই অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার অনন্ত শুভময় ব্যবস্থা! কনক যে আজই খানিক আগে, দেবতার পদে নতশিরে বাসনা জানাইয়াছিল—"দয়া যদি করিয়াছ প্রভু, তবে আরো দয়া কর!' কে জানে এই ঘটনা বুঝি সেই প্রার্থনারই সমসূত্রে গাঁথা, একই অখণ্ড বিধান।

তাহাকে পিষিয়া চুরমার করিয়া, সকল

কুণ্ঠার কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া—দেবতার নিজস্ব করিয়া লইবার জন্যই বুঝি এ সৌভাগ্য শাস্তির বেশে আসিয়াছে! তাই হোক ভগবান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কনকের চক্ষু হইতে দেবতার পূত আশীর্ব্বাদের মত, অজস্র শোণিতের স্রোত যেন মর্ম্মের গ্লানি ধুইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুরূপে খসিয়া পড়িল ……। কনক শান্তমুখে রোগীর সেবা করিতে বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িলেন, বাঁচিবার আশা নাই।

কনক হাসিল। চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে, সকলে মিলিয়া রোগীকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে—নাটমন্দিরে লইয়া আসিল। চিকিৎসক পাশে বসিয়া বহু যত্নে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগের অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলি বিফল, ক্রমশ রোগ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিকিৎসক অপরাহ্ণের পর উঠিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল সময় সন্নিকট।

সেদিন শুক্ল ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোক সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারিদিক ফুল্ল জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! আর মন্দির প্রাঙ্গণে ততোধিক বিরাট অভিনব শান্তি!

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু চাহিল। সকলে বুঝিল, এই শেষ। কনক তখনো রোগীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। রোগী কষ্টে মাথা ঘুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে?"

বিকৃতস্বরে কনক উত্তর দিল, —"দেবদাসী।"

"আমি কোথা?"

"ভগবান বিঠোবার মন্দিরে।"

রোগীর সর্ব্বশরীরে যেন অজস্র তড়িৎ বহিয়া গেল। তাহার মৃত্যুম্লান বিবর্ণ মুখে সহসা একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। রোগী অত্যন্ত সহজভাবে উঠিয়া বিঠোবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কনকের পদ-প্রান্তে নতশির হইল।

জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

"গুরুরূপা জ্ঞানদাত্রী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার আদেশ পালন করেছি, এই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের নীচে, ভগবান বিঠোবাকে সাক্ষী রেখে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, পাঁচ বৎসরের পরে আমি ফিরেছি, ফিরেছি, ফিরেছি!—জগৎ শুনুক আর না শুনুক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমায় আজ শোনাতে এসেছি দেবী, আজ আমি সকলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে, একেবারে ফিরে চলেছি।"

আকস্মিক উত্তেজনার সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়ে দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী ভীষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রোগী ঢলিয়া পড়িল। কনকের চক্ষু দিয়া আবার দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বেদনারুদ্ধকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিল, "সংসারে তোমার মত যাদের তেজস্বী

পার্থ তাহাই ধন্য হইলাম, ভালই হোক্, মন্দই হোক্, তোমরা যে-দিকে ঝোঁকো,—সেদিকে পূর্ণশক্তিতেই ঝোঁকো, আত্মহারা হয়ে যাও! জগতে তাই তোমাদের সাধনাই এত ওতপ্রোত। তোমরা হয় পূর্ণ দেবতা, নয় পূর্ণ অপদেবতা হয়ে দাঁড়াও,—অপূর্ণ থাকতে পার না।..... আশীর্ব্বাদ কর ভাইলাল, আমিও পূর্ণ তেজস্বিতার সাথে নিজের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন আত্মজয়ী হতে পারি।.....

ভাইলাল শান্ত-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, বড় মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিঠোবার দ্বারে আমার মহাশয়া রচিত হয়েছে। কি অপরিসীম আনন্দ! আজ আমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই, আছে শুধু হে বিঠোবা দেব, তোমার পাদপদ্মে বিলীন হবার জন্য শুধু একটি মুহূর্ত্ত।"

ভাইলালের ললাটে তখন বেদনা, ক্ষোভ, ক্লান্তির চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না। ছিল শুধু সহজ-সিক্ত স্বর্গীয় তৃপ্তির একটি অপরূপ দীপ্তি।

উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুকের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাইলাল মহা-সমাধিতে মগ্ন হইল। চারিদিকে উজ্জ্বল ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ শোভায় হাসিতেছিল। সুধাকর-কর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের চক্ষে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া বহিতে লাগিল। মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট এক জ্ঞানী সাধক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গদ্গদকণ্ঠে গাহিতেছিলেন,—

"ন জাতোঽহং মৃতোবাপি—
নাম কর্ম্ম শুভাশুভম্,
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তি কথং মম।"

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেশাচার। বারাণসীর চতুর্দ্দিকে যেরূপ আচার দৃষ্ট হয়, বারাণসীরও দেশাচার তদনুরূপ। অতি অল্প বয়সেই বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৫ হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স ১১ হইতে ১৫। এদেশে বর অপেক্ষা কন্যা বয়সে বড় হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও দ্বিরাগমন ব্যতীত কন্যাগণ স্বামীর বাটীতে যাইতে পান না। সুতরাং স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা আদৌ নাই। সম্ভ্রান্ত অথবা মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রথা নাই, নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এইপ্রথা দৃশ্যমান।

কোনো কোনো মধ্যবিৎ ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতীব ন্যূন। ব্রাহ্ম এবং পাহুলয়া শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য জাতিকে আপন দলভুক্ত করার প্রথা দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথানুসারে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে হয়। আচার্য্য নিরাকার পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তির বর্ণনা করেন। অনন্তর সেই নিরাকার পরমপিতার চরণকমলে আপনাদিগকে সমর্পণ-বিষয়ক একটি গান হইয়া দীক্ষানুষ্ঠান শেষ হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিকে অবশ্য যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠী প্রভৃতি জাতিভেদসূচক সাম্প্রদায়িক চিহ্নগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

পাহুলয়া শিখ স্বীয় দলভুক্ত করিতে হইলে নবাগতের গলায় একখানি তরবারী ঝুলাইয়া তাহাকে আচার্য্যের সম্মুখে দাঁড় করায়। অতঃপর আচার্য্য একটি সরবৎ (চিনির পানা) লইয়া তাহাতে ছুরি ডুবাইয়া কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করেন। অতঃপর সেই সরবতের ছিটা আগন্তুকের মস্তকে দিয়া অবশিষ্টাংশ তাহাকে পান করায়। অনন্তর নবাগত ব্যক্তি আচার্য্যের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জলে নিমজ্জিত করাইয়া সেই চরণামৃত পান করে।

হিন্দু এবং জৈন স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস রাখেন। বৌদ্ধগণের ত্রিপিটকই বিশ্বাস্য। শিখ আদিগ্রন্থে এবং মুসলমান কোরাণে আস্থাবান্। হিন্দু শিখ এবং জৈন পূর্ব্বাস্য হইয়া ভগবানের আরাধনা করে; মুসলমান মক্কার দিকে মুখ ফিরায়। পূর্ব্বোক্ত জাতিত্রয় ধর্ম্মমন্দিরে এবং শেষোক্ত জাতি মসজিদে উপাসনা করে। হিন্দু, শিখ এবং জৈনদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তাহারা দারপরিগ্রহ করিতে পারে। বৌদ্ধগণের যাজকগণ অবিবাহিত থাকে। মুসলমানগণ স্বীয় সঙ্ঘ হইতে যাজক নির্ব্বাচিত করে। গোজাতি হিন্দুগণের আরাধ্য সুতরাং অখাদ্য এবং আমিষাহার হিন্দুর নিষিদ্ধ। শিখগণ গোজাতির প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ কিন্তু আমিষ ভোজনে তাহাদিগের বাধা নাই। মুসলমানগণ শূকর এবং কুক্কুরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং ইহাদিগের মাংস তাহাদিগের নিকট অভক্ষ্য। বৌদ্ধ এবং জৈন প্রাণিহত্যা করে না। অনার্য্য ব্যক্তি ব্যতীত মৃত পশুর মাংস কেহই ভোজন করে না। শিখ তামাকুসেবনে বিরত থাকে, কিন্তু মাদক দ্রব্যে বীতস্পৃহ নহে। মাদক দ্রব্য হিন্দুর নিষিদ্ধ নহে—মুসলমানের বটে। হিন্দু এবং জৈন মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু শিখা কর্ত্তন করে না। কেশ বা শ্মশ্রু কর্ত্তন শিখের পক্ষে নিষিদ্ধ। দাড়ি মুসলমানের মান্য পদার্থ। মস্তক মুণ্ডনে মুসলমানদিগের নিষেধ নাই; শিখা ধারণ তাহাদিগের পক্ষে অবিধি। হিন্দু, শিখ এবং জৈন কোটের বোতাম ডান দিকে এবং মুসলমান বাম দিকে রাখে। হিন্দু এবং জৈন পুরুষগণ ধুতি পরিধান

করে, শিখ জানু পর্য্যন্ত পাজামা পরে। মুসলমানগণের পাজামা ঢিলা। হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের নিকট লাল বা গৈরিক রঙের বস্ত্র পরিধান অবিধি নহে, তবে নীল রং হিন্দুর অবিধি। শিখগণ নীল বা শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী; কিন্তু গৈরিক রং তাহাদিগের নিকট ঘৃণ্য। মুসলমানগণেরও অনুরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। হিন্দু এবং জৈন মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন এবং পানাহার করে বটে, কিন্তু সেই পাত্রে আঁচি থাকা আবশ্যক। ধাতুপাত্র হইলে তাহা কাংশ বা পিত্তলের হওয়া চাই। মুসলমানদিগের মৃণ্ময় পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু পাত্রে আঁচি কাটা হইবে না। ধাতু পাত্র হইলে তাহা তাম্রের হওয়াই বিধি। হিন্দু এবং শিখ প্রত্যহ স্নান করে; মুসলমান এবং বৌদ্ধের নৈমিক স্নানের নিয়ম নাই।

হিন্দু জৈন এবং শিখ অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে। মুসলমানগণ উভয় পক্ষের মত লইয়া লোক সাক্ষী রাখিয়া দার-পরিগ্রহ করে। মুসলমানদের তকচ্ছেদ একটি বিশেষ বিধি। শিখগণ বাপতিস্মা গ্রহণ করে। হিন্দু জৈন এবং শিখ শব দাহ করে, মুসলমান সমাধি দেয় এবং বৌদ্ধগণ হয় পুতিয়া ফেলে, নয় ফেলিয়া দেয়। কৃষকপত্নীগণ মাঠে স্বামীর সাহায্য করে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়-রমণীর সে প্রথা নাই বলিয়া কৃষিকার্য্যে ভাড়াটিয়া লোক রাখিতে হয়। গৃহস্থালীকার্য্য মাত্রই স্ত্রীগণের অধিকৃত। গৃহকার্য্যে ত্রুটি হইলে রমণীগণ পুরুষদিগের নিকট হইতে তিরস্কৃত, এমন কি প্রহৃত হইয়া থাকে। নীচ রমণীরা পঞ্চায়ত দ্বারা শাসা। একাধিক বিবাহ হিন্দু পুরুষদিগের নিষিদ্ধ নহে। রমণীগণ বন্ধ্যা অথবা অপুত্রক হইলে স্বামীকে অন্য বিবাহ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ তাহাতে তাহাদিগের গৃহকার্য্যের লাঘব হইয়া থাকে। বহুবিবাহ মুসলমানগণের নিষিদ্ধ নহে; সুতরাং তাহাদিগের অপত্যও অধিক হইয়া থাকে।

সভা-সমিতি। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম সমিতিতে বারাণসী পূর্ণ। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি প্রধান, তাহার নাম কারমাইকেল্-লাইব্রেরি। ইহা ১৮৭০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। কারমাইকেল সাহেবের হুকুমে বাটীনির্ম্মাণের জন্য মিউনিসিপালিটি হইতে এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হয়। লাইব্রেরির আয় ১৯০০ টাকা। এই লাইব্রেরিতে "কাশী সুজন সমাজ" নামে একটি সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। কাশীর সমধিক উন্নতি করাই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দি ভাষার উন্নতি কল্পে "নাগরী প্রচারিণী সভা" ১৮৯৩ খৃঃ স্থাপিত হয়। ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫০০ এবং বার্ষিক আয় ছয় সহস্র মুদ্রা। ইংরাজ সরকারও এই সমিতিকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। মিত্রগোষ্ঠী নামে একটি সাহিত্য-সমিতি ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির স্বীয় বাটী নাই এবং

আরও অল্প। বান্ধবসমিতি এবং সঙ্গীত সমিতি নামে বাঙালীদিগের দুইটি সমিতি আছে। ইহার সভ্যগণ বাঙালী। থিওসোফিক্যাল সোসাইটী নামে একটি সমিতি আছে। বিবি এ্যানিবেসান্ত ইহার সভাপতি। সমিতির সভ্য-সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল নামে হিন্দুদিগের একটি বৃহৎ সভা আছে। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম প্রচার। সভ্য-সংখ্যা অনূন সাত সহস্র। দারভাঙ্গাধীপ ইহার সভাপতি। এই সভার সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা সম্মিলিত। ব্রহ্মশঙ্কর নামে একটি ধর্ম্মসভা বারাণসী ধামে প্রধান আড্ডা করিয়াছে। ইহার একটি বৃহৎ এবং সুন্দর অট্টালিকাও আছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য সমাজও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উদ্যান। বারাণসীধামে অনেক উদ্যান আছে। তাহাতে সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষই দেখা যায়। বারাণসী আমের জন্যই বিখ্যাত। উত্তমোত্তম পেয়ারা বারাণসীতে পাওয়া গিয়া থাকে। বাঁশ গাছও ভূরি দৃষ্ট হয়।

খনিজ পদার্থ। খনিজ পদার্থের মধ্যে যাহা মানবের ব্যবহারে আইসে তাহাদের নাম কঙ্কর, মৃণ্ময় ইষ্টক এবং "রে"। এতন্মধ্যে শেষোক্ত পদার্থটি উষর জমিতে দেখা যায়। 'রে' দেখিতে ঠিক লবণের ন্যায়। দেশী কাচ প্রস্তুতের জন্য "রে"র আবশ্যক হইয়া থাকে। রজকগণ সাবানের পরিবর্ত্তে "রে"ব্যবহার করিয়া থাকে। কঙ্করের খনি প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়। জমির চারি ফিট নীচে কঙ্কর প্রাপ্তব্য। কঙ্কর চারি প্রকারের; যথা বিছোয়া, গাথিয়া, মাটিময়লা বা পাকালোয়া এবং ছাওয়ান। প্রথম দুইটি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিছোয়া এবং মাটিময়লা জ্বালাইয়া চুণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছাওয়ান কঙ্কর কেবলমাত্র পুঁতিবার কার্য্যে আইসে। বিছোয়া এবং গাথিয়া কঙ্করের আকর গঙ্গার বাম তটে চৌবেপুর, চন্দ্রৌতি, চিক্কি এবং দক্ষিণ তটে বালুয়া, তাণ্ডা, ছমিয়ান এবং ডেল্লা; বরুণা-তীরে —রামেশ্বর এবং কোটা—চন্দৌলি তহশীল, আলিনগর, কানেরি, গঙ্গাপুরে ভিখিপুর ও বামানপুর এবং বারাণসী তহশিলে ফুলপুর, সরাইকাঞ্জি, দানুপুর, বরৌলী, ছুপেপুর, গোঁয়াইপুর, নরপতপুর নামক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাটিময়লা কঙ্কর উল্লিখিত স্থাননিচয়ে পাওয়া যায়। ছাওয়ান কঙ্কর আলিনগর, তেল্লা এবং বালুয়া ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে দেখা যায় না। আকর হইতে কঙ্কর নিষ্কাষণের খরচা পদার্থ-কাঠিন্যে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক এক শত ঘনফুটে পড়িয়া থাকে। মাইল প্রতি গাড়িভাড়া আট আনা হইতে বারো আনা পর্য্যন্ত; বারাণসীতে কঙ্কর নীত হইলে ৪৷৷০ টাকা হইতে ৫৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত পড়ে। প্রত্যেক একশত ঘন ফুট ভাল কঙ্করের চুণ ২০।২১ টাকায়

পাওয়া যায়। ইষ্টক অনেক স্থানেই তৈয়ার হয়। ইষ্টকবিশেষে এক সহস্রের দাম ৫ টাকা হইতে ৮৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতিহাস।

বেদব্যাস-প্রণীত কাশীখণ্ডে বারাণসীর সৃষ্টিসম্বন্ধে এরূপ লেখা আছে যে, একদা সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর নিকট সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ সাধারণ মানব সকল কিরূপে সহজে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে? কারণ ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন ষড়রিপুকে সম্পূর্ণ বশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সাধারণ মানব কিরূপে পারিবে। বিষ্ণু চিন্তা করিয়া একটি লিঙ্গমূর্ত্তি সৃজন করিলেন। তখন তাহা হইতে জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। সৃজনকালে লিঙ্গ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চ ক্রোশ অধিকৃত করিল। ইহাই কাশী নামে খ্যাত। পৃথিবী এককালে জলে নিমগ্ন ছিল এবং লিঙ্গ সেই জলের উপর অচলভাবে অবস্থিতি করিলে বিষ্ণু দেখিলেন যে, স্থানটি ঋষিগণের আশ্রমের পক্ষে অতি সামান্য সুতরাং পৃথিবী সৃজন করিয়া লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। এতদ্ধেতু কাশী পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ। পুরাতন কাশীর সীমার নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চক্রোশী রাস্তা এখনো বিদ্যমান আছে।

কাশীর সৃষ্টি যে সময় হউক না কেন, পৌরাণিক সময়ে ইহার যে আদর অধিক ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাশী দুইটি নামে খ্যাত, বরণা কাশী এবং বারাণসী। কাশী শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় কাশ শব্দ হইতে হইয়াছে। পুরুবংশ-সম্ভূত কাশ নামক জনৈক রাজা হইতে কাশীর উদ্ভব হওয়াই সম্ভব। হরিবংশে কাশীরাজদিগের যে তালিকা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কাশ নামক জনৈক রাজা পুরুর চতুর্থ পুরুষ নিম্নে। কাশী যে কোন্ সময় বারাণসীতে পরিণত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। পুরাণ, কাশীমাহাত্ম্য এবং কাশীখণ্ডে বারাণসীর স্থান বরুণা এবং অসির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বরুণা এবং অসি শব্দযোগে বারাণসী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, কাশীর অধীশ্বর মহাদেব; কিন্তু তিনি কৌশল দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট হন। মহাদেবের অনুপস্থিতিতে দেবগণ যখন নর্ম্মদা নদী-তীরে নূতন কাশী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সভা করেন। ব্রহ্মা সেই অবসরে তাঁহার ভক্ত দিবোদাসকে কাশীরাজ্য অর্পণ করেন। মহাদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বরাজ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার আর নাই। মহাদেবের চর বুন্দীরাজ দিবোদাসকে কোনরূপে পাপকার্য্যে রত করাইয়া তাহার দেবশক্তি অপহরণ করেন। এই সুযোগে মহাদেব দেববর্গে পরিবৃত হইয়া কাশী প্রবেশ করিয়া দিবদাসকে রাজ্যচ্যুত করেন। কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহাদেব রাজত্ব করিয়া

অবিমুক্তেশ্বরকে রাজ্য সমর্পণ করত কৈলাসে গমন করেন। তদবধি কাশী অবিমুক্তেশ্বরের হস্তে আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত আছে যে, বারাণসী কাশীরাজদিগের আবাসভূমি ছিল। কাশীর রাজাদিগের মধ্যে পুরূরব প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন। প্রতিষ্ঠান এখন এলাহাবাদ নামে খ্যাত। ভাগবত পুরাণে কাশী কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধীভূত। আখ্যায়িকায় পুণ্ডরীক কাশীর এবং কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় পুণ্ডরীক কৃষ্ণকে রণে আহ্বান করেন। ফলে পুণ্ডরীক হত হন। তাঁহার পুত্র সুদক্ষও পিতৃ-বৈরী নিধন করিতে গিয়া যমলোকে পিতার অনুগামী হন। কৃষ্ণের সুদর্শন এই সময়ে কাশীকে দগ্ধ করে। ইতিহাস বলেন যে, মহাভারতের বীর ভরত কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কেল্লা বড়া পরগণার বৈরস্থ নামক গ্রামে ছিল। অদ্যাপি সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা ভরত পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ যুদ্ধে হত হন।

হিন্দুর ইতিহাস এই পর্য্যন্তই শেষ। পরে শাক্যমুনির আবির্ভাব হয়। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বারাণসীধামই তাঁহার কেন্দ্র ছিল। সারনাথে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন এখনো দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর ভর এবং সৈরীগণের অভ্যুদয় হয়। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে যে সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ দেখা যায়, তাহা সৈরীগণের বলিয়া খ্যাত। বারাণসী জেলার অন্যান্য স্থান ভরদিগের অধিকৃত ছিল। অতঃপর কান্যকুব্জের রাজাগণ এবং পাটনার রাজাগণ কাশীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্ত রাজাদিগের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি সৈয়দপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দিতে বারাণসীধামে সহারওয়ার রাজপুতগণ শাসনদণ্ড লইয়া সমাগত হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম বনর। ইঁহার দ্বারা রাজঘাটের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গটি বরুণা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। রাজা বনর মামুদ গজনবী দ্বারা হত হন। সহরওয়ার রাজপুতদিগের পতন হওয়ার পর বারাণসীধামের কতকটা কান্যকুব্জের রাঠোর রাজাদিগের হস্তে আইসে। এই বংশের শেষ রাজা জয়চাঁদ। অদ্যাপি তাঁহার তাম্রফলক আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা জয়চাঁদ সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দ্বারা নিহত হন। অতঃপর বহুল ঘোরী বারাণসীধামকে দিল্লীর সম্রাটের রাজত্বভুক্ত করেন। ১৫২৯ খৃঃ কাশী বাবরের হস্তগত হয়। অতঃপর আকবরসাহ বারাণসীধামকে স্বীয় এলাহাবাদ সরকারভুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে বারাণসীধামে অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। সাজাহান তাঁহার পুত্র দারাসিকোকে বারাণসী

ধামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি উপনিষদের এক তরজমা করেন। উহার ভূমিকায় লেখা আছে যে তিনি উক্ত কার্য্যের জন্য ১৫০ জন পণ্ডী নিযুক্ত করেন। পরে দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব মন্দির দেখিলেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন এমন কি কাশীর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত করিবার জন্য তাহার মহম্মদাবাদ নাম দিলেন। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং মহম্মদাবাদ নাম কালেংলোপ পাইল, পুনরায় হিন্দুর কাশীর নাম কাশীই রহিল। মনসারাম এবং বলবন্ত সিংহ বিলোপোন্মুখ কাশীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

১৭৭৫ খৃঃ হইতে ইংরাজরাজের অভ্যুদয় হয়। তদবধি কাশী ইংরাজদিগের হস্তে আছে।

পরিশিষ্ট।

নদীগর্ভ

বারাণসীধামের যদি কিছু দৃশ্য দেখিতে চাও তবে একবার প্রাতঃকালে গঙ্গাতটে আসিয়ো। দেখিবে সূর্য্যদেব আরক্তিম বর্ণে প্রাচীদিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইয়াছেন গঙ্গাগর্ভ হইতে বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া ক্রমে আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রাচী উষাদেবীর আরক্তিম বসনে সজ্জিত হইয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যদেবকে আবাহন করিতেছেন! গঙ্গাপুত্রগণ স্নাতকদিগকে নানারূপ কণ্ঠস্বরে আহ্বান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিলেন। সেই আলোকে দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণের কলরব, জলে স্নাতকদিগের ঝপ ঝপ শব্দ, নরনারীগণের ইতস্তত পদসঞ্চরণ, ঘাটিয়াগণের আহ্বানধ্বনি, বায়ুসঞ্চালিত মন্দিরের ধ্বজা-পতাকার আন্দোলন, এবং ব্রাহ্মণদিগের বেদগান প্রভৃতিতে দৃশ্যটিকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। রমণীগণ সাজিতে পুষ্পমাল্য লইয়া দলে দলে বহির্গত হইতেছে। অদূরে মনিকর্ণিকা-ঘাটে শবদাহ-জনিত ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে সন্ন্যাসিদেহ-লোলুপ গৃধ্রগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে। ঘাটে স্নানের পরও বিশেষ বিশেষ দৃশ্য আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়।

ষ্টেষণ হইতে জনপ্রবাহ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, কাশী হিন্দুদিগের কিরূপ পূজ্য। সহরের মধ্যে সন্ন্যাসিগণ বিবিধবর্ণের বস্ত্রে ভূষিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে। কৌপীনধারী হইতে গেরুয়াবসনপরিহিত সন্ন্যাসিগণ, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা দণ্ড ধারণ করিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষার্থে ভ্রমিতেছে। সহরে যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিদ্বানের অননুমোদিত যে ধর্ম্ম, তাহা অধর্ম্ম। অতএব বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তাই গ্রাহ্য;—কন্যার পুনর্বিবাহ কালে জন্মদাতার গোত্রেরই উল্লেখ হবে, কারণ সেই বংশে তার জন্ম এ বিষয়ে ভুল নেই। যখন স্বামি-কুল ত্যাগ করে' স্বামিকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ "অস্বীকার" করে' তিনি পুনরায় বিবাহে সম্মতা হয়েছেন, এবং পিতৃকুলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন পুনরায় তিনি পিতৃগোত্রে স্থিতা হয়েছেন; অতএব পুনর্বিবাহকালে পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ হওয়া উচিত।

চন্দ্র। তবে তো মেয়েরা ইচ্ছে করলেই যখন-তখন পিতৃগোত্রে ফিরবে?

হরি। যখন-তখন কেন? যদি নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং যদি সেই বিধবা ইচ্ছা করেন, (ইচ্ছা করলে অবশ্য স্বামীগোত্রে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারেন) তবে তিনি পিতৃ-গোত্রে আসতে পারেন, নতুবা নয়।

চন্দ্র। তুমি যে এতক্ষণ বাক্‌চাতুরী করলে, কিন্তু শাস্ত্রের নজির তো একটিও দিলে না।

হরি। অনাবশ্যক বোধে।

চন্দ্র। শাস্ত্রের নজির অনাবশ্যক! এই আমি চল্লুম, তোমাদের সঙ্গে একত্রে উপবেশনেও পাপ আছে।

হরি। বসুন বসুন, রাগ করবেন না। একটা কথা শুনুন।

চন্দ্র। তোমার মাথা-মুণ্ড কি বলবে বল। আর কচ্‌কচি ভাল লাগে না—বেলা হ'য়েচে।

হরি। দেখুন, প্রথমত যদি নিরপেক্ষ ভাবে এবং হৃদয়হীন না হয়ে বিচার করি তবে দেখতে পাই যে, বর্ত্তমানে বিধবা-বিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত। যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন করাই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ উচিত এবং সমাজের কল্যাণকর, তখন ব্যবস্থাও বাহির করা যাবে, এবং গিয়েছে। অবশ্য আমি শাস্ত্রের অননুমোদনে এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিই নে। মায়ের জাত, লক্ষ্মীর জাত, স্ত্রীজাতির প্রতি নৃশংস হয়ে, তাঁদের উপর অত্যাচার প্রভুত্ব নিষ্ঠুরতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে, নিজে সুখভোগ করব বলে তর্ক সুরু করলে, কারো বাপের সাধ্য হবে না যে, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবে। কিন্তু তাই কি মনুষ্যত্ব?

চন্দ্র। কিন্তু বিধবাবিবাহ আরম্ভ হলে, পবিত্র সমাজটা কেমনতর হ'য়ে দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখ দেখি। হায়, হায়, হিন্দুর এমন সুন্দর আদর্শ—এ তোমরা ভাঙতে চাও?

হরি। ভাঙতে চাইনে; আদর্শ রক্ষা করতে কারো নিষেধ থাকবে না। এখন ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করচেন বলে অধ্যাপক নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ হবার কারো নিষেধ নেই—আছেনও অনেক। ব্রহ্মচারিণী বালবিধবা চিরকালই আমাদের চক্ষে দেবী-সদৃশা স্মরণীয়া এবং পূজ্যা থাকবেন। যিনি আপন কন্যা ভগ্নী অথবা পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় হীনা পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূকে উপযুক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যপালন শিক্ষা দিয়ে, তাঁদের স্বর্গের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবেন, তিনি নিজেও পূজনীয়, পুণ্যাত্মা এবং স্বর্গের অধিকারী। আদর্শ ভাঙার কথা বলছেন, কিন্তু আপনারা কালের স্রোতে কোথায় এসে পড়েছেন? নিজের কালের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছেন, মাঝে পড়ে এই বেচারীদের কোথায় ফেলে রেখে আসতে চান? পারতে পারবে কেন? আপনাদের সঙ্গেই স্ত্রীলোকদিগকে বর্দ্ধিত প্রতিপালিত হতে হয়, আপনাদের হাতেই তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, আপনারা যদি একটুও ব্রহ্মচর্য্য দেখাতে পারেন, তবেই তাঁদের উপর এত বোঝা চাপানো শোভা পায়, স্বাভাবিক হয়। এদিকে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা বুঝতে পারচে যে, তারা শেয়াল কুকুর নয়। স্ত্রীলোকের উপর আমরা যে অযথা অত্যাচার করি, একথা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। দেখুন না কেন, যে বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষে" বললেন, "বিধবার যে বিবাহ দিতে চায় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" তিনিই শেষটা তাঁর "নবীনা ও প্রাচীনা" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, "আমরা নিজেরা যথেচ্ছাচারী, অথচ স্ত্রীলোক বালিকা-বয়সে বিধবা হলেও তাকে আর বিবাহ দিতে দিই না!"

চন্দ্র। ভাল কথা। শাস্ত্রে বিধবার যে সকল নিয়ম প্রতিপালনের কথা আছে,—যেমন কেশবিন্যাস, বেশভূষা, তাম্বূল, উত্তম শয্যা, সুন্দর পুরুষের সহিত আলাপন ইত্যাদি পরিহার। কিন্তু এখন থেকে মেয়েরা বিধবা হলে আর তা পালন করবে না! স্বামী মরলেও দস্তুরমত বেশবিন্যাস চলবে। কেননা বিবাহ আবার তো হবে।

হরি। বলেন কি? পরপুরুষের সহিত স্বামীর বিনানুমতিতে আলাপন তো সধবারও মহাপাপ। আর স্বামী যার নেই, যে বিধবা হয়েছে, তার তো নিশ্চয়ই এসকল কঠোর নিয়ম পালন করতে হবে। সে যে বিধবা! আবার যখন সধবা হবে (অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থায়) তখন স্বামীর চিত্তরঞ্জনের জন্য বেশ-ভূষাদি করবে; বয়স্থা স্ত্রীলোকের স্বামীর চিত্তরঞ্জন ব্যতীত বেশভূষার অন্য উদ্দেশ্য হিন্দু কল্পনা করতে পারে না। কেমন করেই বা সে জানবে যে, তার বিবাহ হবেই? বিবাহ হলে তখন অন্য কথা। দেখুন না কেন, স্বামী পরদেশে

থাকলেও হিন্দু স্ত্রীর অনেক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে; যথা,—কবরীবন্ধন, বেশবিন্যাস, উৎসবে নৃত্যগীতে উপস্থিতি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যিনি আপনার আশ্রিতা বিধবাকে (যতদিন পুনর্বিবাহ না হয়) এ সকল নিয়ম পালন না করান, তিনি ঘোর মূর্খ, এবং বিধবার ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা বলে গণ্য—অতএব অধার্ম্মিক ও অহিন্দু।

চন্দ্র। আর একটি কথা। স্ত্রীলোক বিধবা হলে তার পতিকুলের অভিভাবকই তো 'গার্ডিয়ান' (guardian) থাকবেন; তিনি যদি এই বিধবার বিবাহ দিতে না দেন?

হরি। প্রথমত সপ্তদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হলেই স্ত্রীলোক আইনের চক্ষে সাবালিকা হলেন; তখন তিনি আপনার স্বেচ্ছানুসারে পিতার, ভ্রাতার, শ্বশুরের বা দেবরাদির ঘরে আশ্রয় বেছে নিতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছার কথা ছেড়ে দিলেও, আমার বিবেচনায়, যদি পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকে এবং তাঁরা আশ্রয় দেন, তবে বৈধব্যের পরে বালবিধবার পিতৃকুলেই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; এবং তাই-ই সচরাচর হয়ে থাকে, দেখা যায়। কারণ, পিতৃকুলের স্নেহ ও অনুরাগ স্বাভাবিক, এবং স্বামী-অভাবে পিতৃকুল হতেই অধিক হিতের এবং যত্নের আশা করা যায়। অতএব বালবিধবার পক্ষে পিতৃকুলই উপযুক্ত আশ্রয়, এবং পিতৃকুলের অভিভাবকই (যদি বালিকার আপত্তি না থাকে, এবং তিনি আবশ্যক বোধ করেন) নিঃসন্তান বালবিধবার পুনর্বিবাহ দিতে পারেন।

চন্দ্র। অর্থাৎ প্রফুল্লর ভগ্নীর বিবাহ প্রফুল্লই কর্ত্তা হয়ে দেবে;—শ্বশুরকুলের কেহ আপত্তি করতে অথবা অভিভাবকতার দাবী করতে এলে তার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করবে! তোমাদের যুক্তি এই যে, যাকে সম্প্রদান করলুম, সে এক মাসের ভিতরেই পটল তুলল, আর তার বাড়ীর লোকেরা কি না এখন আমাদের এত আদরের এত যত্নের মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে বসবে, —সংসারের একটা বাঁদী রাখবে। স্বভাব চরিত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কিরূপ হয়ে যেতে পারে তার ঠিকানা নেই, তারাতো "পর", তাদের তো আঁতে ঘা লাগবে না;—এই সব আর কি,—কেমন?

হরি। আজ্ঞে অনেকটা তাই-ই বটে।

চন্দ্র। আমি এ সবের মধ্যে থাকতে পারি নে। সরলার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তার ম্লান রুচি মুখখানির দিকে চাইলে আমার এ বৃদ্ধ বয়সের কঠিন বুকও ফেটে যায় সত্য। কিন্তু,—বিধবার আবার বিয়ে!! মনে হ'লেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। কেবল তোমাদের দৌড় কতদূর তাই দেখবার জন্যই আমি এসেছিলুম। আর সত্য ছোঁড়াটা বড় ভাল ছেলে, আমাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; প্রফুল্লটাও পাগলা, আর চিরকাল আবদেরে, ওদের অনুরোধ এড়াতে

পারি নি। এখন যথেষ্ট বিদ্যাপ্রকাশ করা হয়েছে তো? বেলা হয়েছে, আহারাদির চেষ্টায় যাও।

এই বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমরা তাঁহার ও তর্করত্ন মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সভাভঙ্গ হইল। তর্করত্ন ঠাকুরদাদাকে বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য আমি ছাতা লইয়া সঙ্গে চলিলাম। সকলে আপন আপন গৃহে চলিলেন।

৮

ভগ্নমনে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পরন্তু ভবে আর বিবাহ নিতে পারিলাম না। চন্দ্রনাথবাবু বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না? তিনি ধনে, মানে, কুলে, শীলে, গ্রামের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার অসম্মতিতে আমিই বা কি করিব, সত্যেন্দ্রনাথই বা কি করিবেন? তর্করত্ন মহাশয় এবং অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়েরা অর্থে বশ হইতেন, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর সম্মতি কেমন করিয়া পাই?

এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিল। আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে আমার সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সকলেই শেষে স্থির করিলেন যে, আমরা না হয় একটা পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিব। সেকেলেদের, পোঁড়াদের ত্যাগ করিতে হয় করিব। আমাদের একঘরে করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারাই একঘরে হইবেন,—কম্বলের লোম বাছিয়া বাছিয়া একখানি পৃথক কম্বল বুনিতে বসিব, প্রথম কম্বল আপনিই লোপ পাইবে। পাত্রও স্থির হইল। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে পোড়শীর চিকিৎসায় গিয়াছিলাম, তাঁহার স্বামী ওকালতী পাশ করিয়া আলিপুরে প্রাক্‌টিস্ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অনেক সুন্দরী কুমারী তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার দাদা, বন্ধুবর্গ এবং বৌদিদি তাঁহাকে বিবাহে প্ররোচিত করিতেছেন। কিন্তু সবই বিফল হইয়াছে। সংসারের কথা বলিলে তিনি বলেন, "বিদেশে যখন থাকবো তখন অর্থভোগী ভৃত্যেরা আমার সেবা করবে, অসুখ-বিসুখ হলে ছুটে বৌদিদির কাছে আসবো। তিনি কি আমায় ক্রোড়ে স্থান দেবেন না? আমি যে তাঁর বড় ছেলে, তিনি যে আমার মা, বৌদিদি ঘরে আসা অবধি আমি যে মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি" বলেন আর কাঁদেন! বলেন, "একটি ছেলেতো হয়েছে, না বাঁচে, দাদার পুত্রের দ্বারা পিতার বংশরক্ষা হবে। যে দিন সে মরেছে, সেইদিন আমিও মরেছি।" এই সকল প্রলাপ তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্য প্রসঙ্গে স্থির, অবিচলিত, প্রফুল্লবদন, মিষ্টভাষী, কার্য্যতৎপর এবং উৎসাহী।

একদিন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্যান্য অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবসমেত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমাদের গ্রামেরও অনেক

নবা যুবক সেই সঙ্গে রহিলেন। আহারান্তে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সরলাকে বিবাহ করিবার জন্ত ধরিয়া পড়িলেন। তিনি স্বীকার করিলেন,—"প্রফুল্লবাবুর ভগ্নীর নিশ্চয়ই বিবাহ হওয়া উচিত।" এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু নিজে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমার স্ত্রী আছেন।" এবং পকেট হইতে একখানি সুন্দর ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন—সেখানি তাঁহার মৃতা সহধর্ম্মিণীর। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা সকলের সমবেত অনুরোধ, উপরোধ এবং যুক্তিপ্রদর্শন ও প্ররোচনার পর অবশেষে কেবল example set করিবার জন্ত এ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সরলাকে দেখাইতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন "অনাবশ্যক।" তারপর সত্যেন্দ্রনাথ সরলার গুণব্যাখ্যা করিয়া যখন রূপের কথা বলিলেন, তিনি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমি তো এ সব কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি—ক্ষমা করবেন।" তথাপি সত্যেন্দ্র বলিলেন, "প্রফুল্লকে দেখলেই আমার শ্যালিকাকে দেখা হ'ল—সবাএক ছাঁচ।" এই কথার পর অন্ত কথা উঠিল।

বাস্তবিক আমরা ভাই-বোনে সব দেখিতে এক—এক ছাঁচ, এক রং, এক গড়ন। আমার ভগ্নীদের রূপ গুণের সুখ্যাতি গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছিল। মালতী ছিল তাহাদের জোড়া নিকটে কমই ছিল। ইনিও বোধ হয় তাহা লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন। একবার দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমাদের নদীতে বা'র হইতেছে, তখন মেজদির বয়স একাদশ বৎসর, বিবাহ হয় নাই;—তিনি এলোচুলে আল্‌বাট কাটিয়া (মা প্রায় তাঁকে এলোচুলেই রাখিতেন) সাজিয়া গুজিয়া পাড়ার আর আর মেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিতেছিলেন;—শারদসায়াহ্নের চিক্‌চিকে পড়ন্ত রৌদ্র তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছিল; তাই দেখিয়া নটাবেড় গ্রামের বৃদ্ধ দেওয়ানজি মহাশয় তাঁহার নৌকায় বসিয়া বলিয়াছিলেন, "জলের প্রতিমা দেখিব, না ঐ ক্ষুদ্র ডাঙ্গার প্রতিমা দেখিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

পাত্রও স্থির হইল, দণও বাঁধা হইল, অনেক কষ্টে মেজদি, ও সরলাকে রাজী করাইলাম। সব ঠিকঠাক্। সরলাকে মেজদি আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একজন সুশিক্ষিত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পুরোহিত পৌরোহিত্য করিতেও রাজী হইলেন। সব প্রস্তুত—দুদিন পরেই বিবাহ। এমন সময় সরলা কি না পলায়ন করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল! তাহার মনের ভাব কেন এমন হইল? ভাল, চিরকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, সেতো ভাল কথা। থাকুক—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মার্কিণ ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংসার

আমেরিকার মহিলারা বলেন :— "অমুকের শুধু টাকা আছে বলে বিবাহ করিয়ো না, এবং যাঁহার টাকা নাই তাঁহাকেও বিবাহ করিয়ো না, কিন্তু যাঁহার টাকা রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকেই বিবাহ করিয়ো।" সুদূর পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও "ষোড়শী বালিকার" (sweet sixteen) পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে মত প্রকাশ করেন না। সুতরাং সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন। পরিশেষে এমন ঘটে যে, ঐরূপ যুবতীর অনেকগুলি প্রার্থী (suitor) হয়। এবং নিজে tasted girl নামে দেশের নিকট পরিচিত হন।

কোনো কোনো মার্কিণ মহিলা বেশি সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না; তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যে কয়েকটিকে মানুষ করিতে পারিবেন তার বেশি সন্তান ভগবানের নিকট কামনা করেন না। কেহ কেহ অন্তঃসত্ত্বা হইবামাত্র, যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন তিনি যে ঘরে বেশিক্ষণ থাকেন সেই ঘরটিকে বিশেষভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ঘরটি যদি বক্তার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সে-গর্ভের পুত্র বড় বক্তা হইবে, যদি প্রচারকের ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভের পুত্র একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইবে, যদি সুন্দরী বালিকার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভে সুন্দরী বালিকার জন্ম হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তখনি তাহাকে ওজন করা হয়। তারপর যখন বাৎসরিক শিশু-প্রদর্শনী (Baby show) হয়, তখন শিশুকে প্রদর্শনীতে পাঠান হয়, প্রদর্শনী কার্ডে শিশুর মাতার নাম, বয়স, ওজন ও প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান তাহাও লেখা থাকে। সে দেশের মাতারা সতত চেষ্টা করেন ও এমনভাবে জীবনযাপন করেন যাহাতে বলিষ্ঠ শিশু প্রসব করিতে পারেন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আমেরিকার বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে ঐ রকম শিশু-প্রদর্শনী মধ্যে মধ্যে খুলিলে ভাল হয় না কি?

আমাদের দেশে যদি কাহারো একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, আমরা সকলেই একটু ত্রস্ত হই। কারণ সে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, অনেক টাকার দরকার হইবে, এবং পরিশেষে সে পরগৃহে চলিয়া যাইবে।

আমেরিকাতে কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সে পরিবারে খুবই আনন্দ, কারণ সেই মেয়ের বিবাহ দিলে সেই পরিবারে আর একটি সন্তান (অর্থাৎ ভাবী জামাতা) হইবে। আমেরিকাতে আমি যে পরিবারে ছিলাম, সেই পরিবারের পুত্রবধূ যখন পিতৃ আলয়ে যান, তখন তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে চুম্বন করিলেন দেখিয়া আমি Rev. Poeকে (যিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা ও পুত্র-বধূর শ্বশুর) বলি—আমাদের দেশে এরূপ প্রথা নাই। তিনি তদুত্তরে বলেন,—"আমরা আমাদের জামাতা ও পুত্রবধূকে আপনার পুত্র কন্যার ন্যায় দেখিয়া থাকি।"

আমেরিকার কোনো কোনো মহিলা স্বামী অপেক্ষা বেশি মিতব্যয়ী। একবার একজন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলেন,—"তুমি কেন মিসেস্ অমুকের মতন পোষাক পরিতে পার না?" তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন,—"আমাদের টাকায় কুলিয়ে উঠে না।" হোটেলের waiterদের বলিতে শুনিয়াছি, যে ডিনার পুরুষের কাছে সস্তা মনে হয়, তাহা স্ত্রীলোকদিগের নিকট মহার্ঘ।

সম্মান।

নারীজাতি কিরূপ সম্মান পাইয়া থাকে, তাহা যদি পাঠক পাঠিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমেরিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। সভাতে, ক্লাসে সকল স্থানেই মহিলাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। ট্রাম গাড়ীতে কিম্বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় যদি গাড়ীতে স্থান না থাকে, তবে কোনো-না-কোনো পুরুষ স্বীয় স্থান তৎক্ষণাৎ রমণীর জন্য ছাড়িয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া যাইবেন। দোকানে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইলে পুরুষের পরে যে মহিলা কিছু কিনিবার জন্য আসেন, তাঁহাকে আগে কিনিতে দিয়া পুরুষ পরে কিনিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। রমণীর সহিত একত্র বেড়াইতে বাহির হইলে, জনতাতে রমণীকে আগে হাঁটাইয়া পুরুষ তাঁহার বা ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকেন। দুরন্ত শীতে গির্জ্জাতে ঢুকিয়া যখন মহিলারা ভারী over-coat খুলিয়া বসেন, তখন পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিরা সেই over-coat তাঁহাদের গায়ে পরাইয়া দিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। টাইটানিক্ জাহাজ যখন আটলান্টিক্ মহাসাগরে ডুবিয়া যায়, তখন জীবন-রক্ষার্থ নৌকা করিয়া আরোহীদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই নিয়ম ঘোষণা করা হয়—প্রথমে শিশু সন্তানেরা, তাহার পর মহিলারা তাহার পর পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে জীবনরক্ষার নৌকাতে উঠিবেন। আসন্ন বিপদকালেও সেখানে রমণীকুল সম্মান পাইয়া থাকেন।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

ঘুসুড়া

সেকালের প্রাচীনা গৃহিণীগণ, এমন কি কবিরাজ মহাশয়রাও কাহারো পুরাতন জ্বর হইলে ঘুসুড়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। এই ঘুসড়া ঔষধ পুরাতন জ্বরে মহা উপকারী। আজকাল জ্বর হইলেই প্রায় পুরাতন জ্বরে দাঁড়ায়। পুরাতন জ্বরে মুখাবান্ ডাক্তারি বা কবিরাজী ঔষধ সেবন না করিয়া পল্লীবাসী গৃহস্থগণ অনায়াসেই গৃহে বসিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করত সেবন করিয়া দেখিতে পারেন; ইহাতে উপকার হয় কি না। সেকালে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, তখন এত ডাক্তার কবিরাজ ছিল না লোকে নিজ নিজ চেষ্টাতে বিনাব্যয়ে রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এই মহা উপকারী ঔষধের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। অতএব কিপ্রকারে ইহা প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়, তাহা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা লোকে ইহা ব্যবহার করিলে সুফল প্রাপ্ত করিতে পারেন।

ঘুসুড়া প্রস্তুতের নিয়ম।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া ও শিউলিপাতা (কাহারো কাহারো মতে অথবা প্রয়োজন বুঝিলে আদাও একভাগ দেওয়া হয়) এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকটি সমান পরিমাণ লইয়া একত্রে অল্প থেঁতো করিয়া কচি কলাপাতাদ্বারা চারি পাঁচ পুরু করিয়া বাঁধিতে হইবে। অনন্তর সেই পুঁটুলির উপর-নীচে ঘুঁটের আগুন দিয়া যাহাতে পুঁটুলি-মধ্যস্থ ঔষধগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তত সময় রাখা উচিত। পরে শীতল হইলে কলাপাতা খুলিয়া ঔষধটি গ্রহণ করিবে। এই ঘুসুড়ার রস প্রতিদিন সকালে দুই তোলা ও বৈকালে দুই তোলা অল্প মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপসর্গহীন প্রায় অধিকাংশ পুরাতন জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। বাসী ঘুসুড়ায় তত উপকার হয় না। প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া খাওয়াই ভাল।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

রবি ও শশী।

নবীন তপনে হেরি লোহিত বরণ,
ম্লান শশী কহে ধীরে বিষাদে মগন;—
"যবে আমি পুনরায় হইব উদিত,
হবে তব দীন দশা হাসি-বিরহিত।"

কহে রবি, "তেজোহীন অবোধ চন্দ্রমা,
মোর করে তব কর জানে সেই ক্ষমা;
জাননা অবোধ তুমি সতের ধরণ,
উদয়ে বিষাদে মোর একই বরণ।"

শ্রীননীবালা দেবী।

সংবাদ।

১। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে ২রা এপ্রেল বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় বোম্বাই বন্দর হইতে ডাক-জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিবেন। ভাবী বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ২১শে মার্চ্চ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবেন।

২। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর অখিল ভারতবর্ষীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তার স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর দুঃখমোচনের জন্য "ফাল্গুনী" নামক একখানি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ৮১৭১ টাকা উঠিয়াছিল। এই অর্থ সমুদয়ই দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছেন। অভিনয় ব্যাপারে ১০৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা সমস্তই শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন।

৪। সম্প্রতি অষ্ট্রীয়ানগণ এক প্রকার নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনা যাইতেছে। এই যন্ত্র হইতে ৮০ হাত দীর্ঘ অগ্নিশিখা বহির্গত হয়।

৫। বরদার মহারাজা গায়কোয়াড় স্বরাজ্যে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণের দৈহিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবধারণ করেন, ছাত্রগণের উপযুক্ত আহারের অভাবই তাহাদের দৈহিক অবনতির কারণ। ইহার প্রতিকারার্থে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বিনামূল্যে উপযুক্ত জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের আশাতিরিক্ত উন্নতি হইয়াছে। এদেশের অধিকাংশ ছাত্রই অনাহারে শুষ্কতর পরিশ্রম করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। এই ব্যবস্থা যদি এদেশে করা হয় তাহাহইলে ছাত্রগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৬। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার। সংপ্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৩ মাসের মধ্যে ৪৪টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

৭। পুণা মহিলাশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণবাই ঠাকুর ও অধ্যাপক কার্ভে এলাহাবাদে আসিয়া মিঃ সি, ওয়াই, চিন্তামণির নেতৃত্বাধীনে এক সভায় স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

সুভদ্রা-পরিণয়।

তোমার টঙ্কারে সুরাসুর নরে
তুমি এবে করিয়া কম্পিতকায়।
কেন গো কার্ত্তনী হ'য়ে বীরমণি
রৈবতক দুর্গে লইয়া আশ্রয়।
গুণময় গাণ্ডীব করিয়ে নির্জ্জীব
নাহি জানি এখন কাহার শরে
হইয়ে আহত তাজি বীরব্রত
কাটাইছ কাল অরীর অন্তরে।
হেন অনুমানি বুঝি হৃদিখানি
যাদব-কুমারী করিয়াছে জয়।
চারু উপবনে সুভদ্রার সনে
হইয়াছে বুঝি চিত্ত-বিনিময়।
অথচ নেহারি বেশে ব্রহ্মচারী
আচরণে তার বিপরীত ভাব।
সন্ন্যাসী ধরম চিত্তের সংযম,
কুলবালা-পরে দৃষ্টি অসম্ভব।
পাণ্ডবগৌরব সব পরাভব
নারী-হস্তে আজি পাণ্ডুকুলমণি।
ত্রিভুবন জয় করিয়ে বিজয়
হইলে হেথায় পরাজয় মানি।
যাহার কারণে রয়েছ এখানে
সে যে অসামান্যা রমণীকুলে।
বসুদেবানুজা শ্রীকৃষ্ণ-অনুজা
অনুপমা বামা হয় এ ভূতলে।
আশ্রয়দাতার প্রতি এ প্রকার
অনুচিত তব হেন ব্যবহার।
আতিথেয় ব্রত করি বিধিমত
যাদবের এই যোগ্য পুরস্কার।
রেবতীরমণ শুনিবে যখন
কেমনে সে রোষে পাইবে ত্রাণ?
দাবানল-সম যে ক্রোধ বিষম
জলধির জলে না হবে নির্ব্বাণ।
অথবা যে পদ ভবের সম্পদ,
সে শ্রীপদে যবে লয়েছে শরণ।
ভদ্রা-পাণিতল তব করতল
সংশয় ইহাতে নাহিক কোন।
ধন্য কাশীদাস ভারতীর দাস
তোমার অতুল কল্পনার বলে
ভদ্রা-পরিণয় নরনারীচয়
হেরে ধন্য হলো এ ধরণীতলে।

শ্রীসরলাবালা বিশ্বাস।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীমন্মথলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং স্কাটিয়াগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 631 March, 1916

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৫৩ বর্ষ। ৬৩১ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২২। মার্চ্চ, ১৯১৬। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গান।

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুক নাকো গহন রাতি,
হোক্ না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্
মেঘে আকাশ ডোবা;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্ না তারার শোভা।
সাথী যারা আছে, তারা
তোমায় আপন বলে'
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে?
উঠ্‌বে রে ঝড় দুল্‌বে রে বুক্
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

২

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে
সকল দেহে প্রভাত-বায়ু
ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে

পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,

এই যে ভুবন দিকে দিকে
পুরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাবর্ত্তন।

(গল্প)

পিতা-মাতা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বিনয়ভূষণ, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পর তাহার প্রকৃতিতে বিনয়ের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না, বরং দিন-দিন তাহার বিপরীত গুণটাই প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিনয়ের বয়স ও গুণের আতিশয্য যতই বাড়িতে লাগিল, পাঠশালার গুরু-মহাশয় হইতে গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ ততই দিন-দিন শঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোন দিন কাহার উপর যে তাহার শুভদৃষ্টি পড়িবে তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। যদি কেহ তাহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে কিছু বলিত তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার আর অন্ত থাকিত না। কে যে কোথা হইতে অলক্ষ্যে নানা উৎপাৎ ঘটায় তাহার সন্ধান কেহ পায় না, কিন্তু উপদ্রবের জ্বালায় তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তাঁহার সযত্নরোপিত কলমের আমগাছটির প্রথম ফল-দুইটি দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর দুই এক দিন গেলে সুপক্ক আম-দুইটি গৃহদেবতার ভোগে দিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার আগেই একদিন প্রভাতে তিনি দেখিলেন, বিনয়-ভূষণ অতি নিশ্চিন্তভাবে সেই দেবোদ্দিষ্ট ফল-দুইটি নিজের ভোগে লাগাইতেছেন! এই দুর্ব্যবহারে সহসা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া যখন তিনি বিনয়কে 'পাষণ্ড বেল্লিক পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত' ইত্যাদি নানা অভিধানে ভূষিত করিতেছিলেন, তখন বিনয়ভূষণ অতি নিরীহভাবে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এই ভেদবুদ্ধি কিছুতেই শোভা পায় না; যেহেতু তিনি নিজেই কতবার বলিয়াছেন যে, ভগবান এই স্থাবরজঙ্গমময় বিশ্বের সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, সুতরাং দেবোদ্দিষ্ট ফল দুইটি শিলাময় দেবতার ভোগে না লাগিলেও মূলতঃ তাঁহাকেই সমর্পিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্যের উষ্ণ মস্তিষ্ক এই মহতী উক্তির গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তিনি বিনয়কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার ন্যায় দুষ্কৃতকারী নরাধমের যে ইহকাল বা পরকালে কোথাও সুগতি নাই তাহা বিশেষভাবে সকলের কাছে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার ৪।৭ দিন পরে একদিন দেখা গেল, ভট্টাচার্য্যের সেই অতি যত্নের ফলন্ত গাছটি কাহার নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন এবং তাঁহার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহার চিরপরিচিত আবাস ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে।

বিস্তর সন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া যখন গাভী ও গাছের শোকে ভট্টাচার্য্য একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার গৃহিণী সেই অজ্ঞাত উৎপীড়কের ও তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে

নানাবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে করিতে তাহার মুণ্ড ভক্ষণ করিতে যমরাজকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সেই নিষ্ফল আক্রোশের অন্তরালে থাকিয়া বিনয়ভূষণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল।

রামধন মুখুয্যে বিনয়দের বাড়ীর পাশেই থাকেন। তেজারতি কারবারে তাঁহার বেশ দু'পয়সা আয় আছে। কিন্তু তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে মাত্রাটা কিছু অধিক চড়িয়া যাওয়ায় গ্রামে তাঁহার একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল যে, প্রভাতে কেহ তাঁহার শ্রীমুখখানি দর্শন করিয়া ফেলিলে তাহার আর সে দিন অন্ন জুটিত না। এই শুনামটিই মুখুয্যেকে চারিদিকে বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। এক এক দিন তাঁহার প্রতি বিনয়ের দৃষ্টি পড়িত।

প্রভাতে নিজের ঘরে বসিয়া বৃদ্ধ হয় তো এক মনে খাতাপত্র খুলিয়া হিসাব মিলাইতেছেন, বিনয় গিয়া অতি শান্ত-শিষ্ট-ভাবে প্রণাম করিয়া কাছে বসিল। মুখুয্যে খাতা হইতে চোখ তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—কিহে বাপু, কি মনে করে? কোনো দরকারে এসেছ বুঝি?

বিনয় বলিল,—না, বিশেষ কিছু নয়—এই দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল—তাই বল্‌তে এসেছি।

মুখুয্যে কথাটা শুনিবার জন্য নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনয় তখন মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া যেন কতই কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—এই বলছিলাম কি—যদি আপনি এই ঘরের সামনের দরজাটায় একটা পর্দ্দা খাটিয়ে দেন—তা হ'লে আমাদের বড়ই উপকার হয়। নয়তো আমাদের বড় দুর্গতি হচ্ছে।

এ কথাটার অর্থ সহসা বুঝিতে না পারিয়া নিরীহ বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "পর্দ্দা খাটিয়ে দেবো! কেন পর্দ্দা খাটিয়ে দিয়ে কি হবে?" বিনয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তা' না হলে আমাদের তো বড়ই দুর্দ্দশা হয়—এই ঘরটার ঠিক সামনের ঘরেই রাত্রে আমরা শুই। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে দাঁড়ালেই আপনার দিকেই প্রথম নজর পড়ে; তাতে অর্দ্ধেক দিন খাওয়াই হয় না আমাদের! তাই বলছি, যদি এই দরজাটাতে একটা পর্দ্দা দিয়ে দেন তা হ'লে বড়ই উপকার হয়।

এতক্ষণে কথাটার মর্ম্ম বুঝিয়া মুখুয্যে সহসা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—হারামজাদা, বদমাস, বাড়ী বয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসে জুটেছ! বাপবয়সী লোকের সঙ্গে ঠাট্টা! লেখাপড়া শিখে বেশ জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। যাচ্ছি এখনি তোর বাপের কাছে—মজা দেখাচ্ছি! হতভাগা।

বিনয় হাসিতে-হাসিতে বলিল,—আজ্ঞে আপনি খামোকা অত চটচেন কেন? আমাদের দুর্গতি-টাও তো একবার ভেবে দেখ্‌তে হয়!

মুখুয্যে বলিলেন,—বেরিয়ে যা বলছি আমাদের বাড়ী থেকে। নয়তো এই খড়মের চোটে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। ফাজলামী করবার আর জায়গা পাস নি বটে! আমার হাতে পড়লে আমি তিন দিনে তোকে টাট্ করে ছেড়ে দিতাম।

মুখুয্যে যতই রাগিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, বিনয় বাহিরে আসিয়া ততই হাসিতে হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

এইরূপে তাহার বিনয়ের মাত্রাধিক্যে গ্রামবাসীদের সহিষ্ণুতা যখন ক্রমে চরম সীমায় উঠিয়াছে এবং কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ-বা অন্তরে যখন তাহার সম্বন্ধে ভগবানের দরবারে নানারূপ মঙ্গল কামনা করিতেছে, তখন একদিন সকলে সবিস্ময়ে শুনিল যে, বিনয়ভূষণ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে।

কথাটা প্রথমে কেহ বিশ্বাস করিল না। সে

নিয়মিতরূপেই ইস্কুলে যাইত বটে, কিন্তু পড়া করিতে তাহাকে কেহ কখনো দেখে নাই। সাঁতার-কাটা, ঘুড়ি-উড়ানো, মারামারি, দাঙ্গা করিয়া যে সর্ব্বক্ষণ কাটাইয়াছে, সে আবার পাশ করিবে! কিন্তু কেহ বিশ্বাস না করিলেও কথাটা যে সত্য, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইল হাঁ বিনয় একটা ছেলে বটে। পড়িয়া তো অনেকেই পাশ করে, কিন্তু না-পড়িয়া কে এমন হয়? তাহার পিতামাতা এ সংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শীঘ্রই তাহার বিবাহ দিয়া ঘরে বধূ আনিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনয়ের ইচ্ছাটা যে তাঁহাদের ইচ্ছার ঠিক বিপরীত, তাহা সে প্রবলভাবে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিল। এবং কলেজে পড়িবার জন্য শীঘ্রই সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

২

কলেজে যাহাদের সহিত বিনয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রমোদলালের কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রমোদের পিতা জগৎবাবু কোনো সওদাগরী আপিসের মুৎসুদ্দীর কাজ করিতেন। তিনি কতকটা আধুনিক তন্ত্রের লোক—হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও প্রচলিত রীতি-নীতিগুলি বড়-একটা মানিয়া চলিতেন না। তাঁহার কন্যা-দুটি ইস্কুলে লেখাপড়া করিত, এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিলেও তিনি তাহার বিবাহ দেন নাই, এজন্য লোকে তাঁহার চালচলন-সম্বন্ধে নানা কথা রটাইত।

জগৎবাবুর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য প্রমোদ একদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। জগৎবাবু তখন বাহিরের ঘরে একখানা সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। প্রমোদ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'বাবা, আজ বিনয়কে ধরে এনেছি; তোমার মতের সঙ্গে ওর মতগুলো ভালরকম মিলে যায় বলে আমি তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।'

জগৎবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। এবং বিনয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তাহার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন,—বোসো বাবা, প্রমোদের মুখে তোমার কথা শুনে পর্য্যন্ত তোমাকে দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে ছিল। কতদিন আগে থেকে তোমাকে ডেকে আনবার জন্য আমি ওকে বলেছিলাম।

প্রমোদ বলিল,—তুমি বলবার আগে থেকেই আমি ওকে আনতে চেষ্টা করছি। ও বড্ড কুনো সহজে কি আসতে চায়? যখনি দেখা হয় তখনি দেখি একখানা বই হাতে করে বসে আছে!

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি কি সব সময়েই পড়াশুনা কর? বৈকালেও বেড়াতে বা খেলতে যাও না?

বিনয় বলিল,—না, বৈকালে একবার বেড়াতে যাই বটে, তবে খেলা বা বেড়ানোর চেয়ে পড়তেই আমার বেশী ভাল লাগে। বৈকালে প্রায়ই কোনো লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ে আসি।

ইহা শুনিয়া জগৎবাবু বলিলেন—তা হলে তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসেও পড়তে পার। আমারও পড়াটা বড় ভাল লাগে। যদিও আমার কাজ করে বেশী সময় পাই নে, তবু যেটুকু সময় থাকে আমি তাতেই পড়ার চর্চ্চা রাখি। বিশেষ এই সন্ধ্যার সময়টা তো আমি অন্য কোনো কাজে হাত দিই নে। আমার লাইব্রেরীতে খুব যে সংগ্রহ আছে তা নয়—তবে নিতান্ত কমও নেই। তুমি যখন-ইচ্ছে তখনি এখানে এসো।

কলিকাতায় আসিয়া বিনয়ের প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার বাল্যের চাঞ্চল্য ও দুষ্টবুদ্ধি দূর হইয়া দিন দিন তাহার জ্ঞান-পিপাসা

বাড়িতেছিল। কলেজের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখিতে সে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে, সমস্তই সে জানিতে চায়; তাই সে যখন যেখানে কোনো ভাল পুস্তক পাইত, কলেজের পড়া সারিয়া সময়মত তাহা পাঠ করিত। অবসরমত লাইব্রেরীতে গিয়া ইচ্ছামত পাঠে নিমগ্ন থাকিত। তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে গ্রন্থকীট বলিয়া কত বিদ্রূপ করিত, তথাপি তাহাতে তাহার কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না; কিন্তু তাহার স্বভাবের দুই একটি দোষ সে ছাড়িতে পারে নাই। তাহার কোনো মত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না। যে সময় যে খেয়াল মাথায় আসিত সে তখন সেইরূপ কাজ করিত। সময়-সময় অতি সামান্য কারণেই সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইত না। তাঁহাদের কথা চলিতেছে, এমন সময়ে লাবণ্য আসিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইল। বেহারা তাহার পশ্চাতে ট্রের উপর চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, লাবণ্য পিতার সম্মুখে চা রাখিতেই তিনি বলিলেন,—বিনয়বাবুকে চা দাও লাবণ্য, উনি তোমার দাদার বন্ধু।

লাবণ্য দুই পেয়ালা চা লইয়া বিনয় ও প্রমোদের সম্মুখে রাখিল। জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে বলিলেন,—'বিনয়, এইটি আমার বড় মেয়ে। সন্ধ্যার পর যখনি তুমি আসবে, দেখবে এই ঘরটিতে আমি আর লাবণ্য দুজনে পড়ছি আর গল্প করছি। প্রমোদ সব সময় বাড়ী থাকে না, ওর বন্ধু-বান্ধবদের কাছেই প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে আসে; আমিও তাতে বাধা দিনে; কিন্তু লাবণ্য না থাকলে আমার এক মুহূর্ত্তও চলে না! আর ওরও এমনি স্বভাব যে, আমার যা-কিছু কাজ সব নিজে না করলে ওর তৃপ্তি হয় না, আর সন্ধ্যার সময়টি এই বুড়ো বাবার সঙ্গ না পেলে ওর সময় কোনোমতেই কাটতে চায় না। ইহা বলিয়াই জগৎবাবু সহাস্যে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। লাবণ্যও সলজ্জভাবে মুখ নত করিল।

লাবণ্যর উপস্থিতিতে বিনয় একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। এরূপ বয়স্থা কিশোরীর সহিত আলাপে সে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু জগৎবাবুর এত পরিচয় করিয়া দেওয়ার পর দুই একটা কথা না বলা বড় অভদ্রতা হয়, সুতরাং সে বিশেষ চেষ্টায় সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া লাবণ্যকে বলিল,—আপনিও বুঝি পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসেন?

লাবণ্য বলিল,—হাঁ, আমি বাবার সঙ্গে পড়তে ভালবাসি; খুব ছোটবেলা হ'তে বাবার কাছে থেকে ও পড়ে-পড়ে এখন এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, একদিন পড়া বন্ধ হলেই কষ্ট বোধ হয়।

ইহার পর বিনয় আর কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন,—এবার থেকে আমাদের একজন সঙ্গী বাড়বে লাবণ্য, বিনয়বাবু মাঝে মাঝে এখানে লাইব্রেরীতে পড়তে আসবেন। উনি যখন আসবেন, আমি যদি না থাকি, ওঁকে লাইব্রেরী-ঘর খুলে দিও।

লাবণ্য উৎসাহের সহিত বলিল,—তা' হ'লে তো খুব ভালই হবে বাবা, আমি আমার পড়ার যেখানটা বুঝতে না পারব, ওঁর কাছ থেকে বুঝে নিতে পারব।

দিন-দিন জগৎবাবুর পরিবারের সহিত বিনয়ের ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল। সে প্রায় বৈকাল হইলেই প্রমোদের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিয়া আসিত। প্রমোদ প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না। বিনয় জগৎবাবুর নিকটে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বই পড়িয়া ও গল্প করিয়া কাটাইয়া যাইত। লাবণ্যও প্রায় সে সময় উপস্থিত থাকিত। এইরূপ মেলা-মেশার ফলে বিনয়ের সব সঙ্কোচ ও

লজ্জা দূর হইয়া যাইতে লাগিল এবং উন্নতচরিত্র শান্তপ্রকৃতি জগৎবাবুর প্রতি তাহার অন্তর একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল।

৩

জগৎবাবুর পত্নী লাবণ্যর বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাত্রের অনুসন্ধানে তিনি দুই তিনটি ঘট্‌কী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন যে-কোনো পাত্রের সন্ধান আনিত, জগৎবাবু কোনো-না-কোনো ছল ধরিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেন; এ বিষয় লইয়া গৃহিণীর সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে মনান্তর ঘটিত।

আজ দুপুরবেলা ঘট্‌কী একটি অতি প্রার্থনীয় সম্বন্ধ আনিয়াছিল। পাত্র কোনো জমীদারের ছেলে, দুই তিনটা পাশ করিয়াছে, ধন-সম্পত্তি মান-সম্ভ্রম অগাধ। কত বড় ঘর হইতে তাহার জন্য সম্বন্ধ আসিতেছে, ঘট্‌কী তো বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে যেন সে ফিরিয়া আসিবার আগে কোথাও কথা দেওয়া না হয়, কিন্তু এখন কর্ত্তা এসব শুনিয়া একটু শীঘ্র সেখানে কথা পাড়েন তবে তো হয়—না হইলে সে-সব ছেলে পড়িয়া থাকিবে না—কত ভাল ঘর হইতে সে পাত্র লুফিয়া লইবে!

গৃহিণী সব শুনিয়া সেখানেই কথা পাড়িবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। এবার কর্ত্তা আর কি ওজর করিবেন? ঘর বর সব ভাল, ছেলে বিদ্বান্, কোনো কথা বলিবার জো নাই, ইহাতেও যদি তাঁহার মন না উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

বৈকালে আপিস হইতে আসিয়া জগৎবাবু জলযোগ করিতে বসিলে গৃহিণী বলিলেন, 'আজ ঘট্‌কী লাবণ্যর জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছিল।'

—সত্যি নাকি! কোথাকার ছেলে?

গৃহিণী উৎসাহের সহিত ছেলের রূপ-গুণ ও বংশ-মর্য্যাদার কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ করিয়া উপসংহারে তিনি বলিলেন,—এমন সব-দিকে-ভাল ছেলে আর পাবে না। দেরি না করে এইখানেই কথা পেড়ে ফেল।

জগৎবাবু বলিলেন,—তুমি যে আসল কথাটাই ভুলে গেলে। কথা পাড়বার আগে তো দেখ্‌তে হবে যে তাদের খাঁই মেটাবার ক্ষমতা আমার আছে কি না? সে কথা ঘট্‌কী কিছু বল্‌লে না?

গৃহিণী বলিলেন,—তা বলেছে বই কি? সে এমন কিছু বেশী না; হাজার দশেক হ'লেই হবে!

জগৎবাবু শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গৃহিণী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কি, কথা কও না যে? দশ হাজার টাকা কি তোমার পক্ষে এত বেশী হ'ল? এ টাকা না পেলে তারা রাজী হবে না। অত বড় ঘরে মেয়ে দেবে তার চেয়ে দশ হাজার টাকার ভাবনা তোমার বেশী হ'ল? যক্ষের ধন আগ্‌লে বসে থাক্‌বে না কি?

জগৎবাবু বলিলেন,—আমি যে কি ভাবছি, তা তুমি বুঝছ না। আমি দশ হাজার কেন, বিশ হাজার টাকা মেয়েকে যৌতুক দিতে পারি, কিন্তু সে আমার নিজের ইচ্ছায়। আমার মেয়েকে আমার যা সাধ্য হবে আমি স্বেচ্ছায় দেবো, কিন্তু কেউ যে পণে বদ্ধ করে আমার টাকার পরিমাণে মেয়ে ঘরে নেবে, সেটা আমি সহ্য করতে পারি নে।

গৃহিণী এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন; এবং বলিলেন,—এমন কথাও কখনো শুনি নি! চিরকাল ধরে যে নিয়ম চলে আসছে, তোমার মেয়ের বেলায় তা রদ হবে? কেন তাদেরই বা এত গরজ কিসের যে একটা দেনা-পাওনার কথা না বলে অমনি তোমার মেয়ে নেবে? আর কি তাদের মেয়ে জুট্‌বে না?

জগৎবাবু বলিলেন,—জুট্‌বে না তা কি বল্‌তে পারি? যদি তারা ওর চেয়েও বেশী টাকার দাবী করত, তা হলেও কত মেয়ের বাপ মাথায় করে

মেয়ে আর টাকা তুলে দিয়ে আসত। এই যে আজকাল আমাদের সমাজে ছেলেমেয়ের বিয়ে একটা জঘন্য ব্যবসায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এর জন্য মেয়ের বাপেরাই প্রধানতঃ দায়ী। কেন তারা বরপক্ষের সব অসঙ্গত দাবী মাথা পেতে নিতে যায়?

গৃহিণী বলিলেন,—কি করবে না নিয়ে? মেয়ে নিয়ে চিরকাল বসে থাকতে তো পারে না? আর তা-ছাড়া যা চিরকালের নিয়ম, তা না মান্‌লে চলবে কেন?

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন,—ঐখানেই তোমার বিষম ভুল। চিরকাল এ নিয়ম কখনো ছিল না, এসব এখনই কিছুদিন আগে থেকে হয়েচে। আর যদি বহুকাল থেকে একটা কুপ্রথা সমাজে চলেই এসে থাকে, মানুষে তার প্রতীকার করবে না? নিয়ম হয় আর কি করে? মানুষেই করেছে তো? মানুষেই যা সৃষ্টি করেছে, মানুষের দ্বারাই আবার তা ভাঙ্‌বে।

গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন,—আমি তোমার অত সাত-সতর শুনতে চাই নি; মেয়ের বিয়ে দেবে কি না, তাই বল। ষোলো বছরের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে বসে' রইল, তার বিয়ের কথা বলতে গেলেই যত অনাসৃষ্টি বক্তৃতা জুড়ে দেবেন! ভাল জ্বালাতেই আমি পড়েছি। যা হোক, তা হ'লে ওখানে বিয়ে দিতে তোমার মন নেই?

জগৎবাবু বলিলেন,—তুমি রাগ কোরো না—ও সম্বন্ধটা সত্যিই আমার মনে ধরছে না!

'আমি আর এ সংসারের কোনো কথায় থাকবো না! যার যা-ইচ্ছে সে তাই করুক্। আমি কোথাকার কে যে আমার কথা থাকবে'? বলিয়া গৃহিণী রাগে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া জগৎবাবু স্ত্রীকে বলিলেন,—তুমি যে মেয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ—আমিই কি মনে কর নিশ্চিন্ত আছি? আমি কি লাবণ্যর বিয়ের কথা ভাবছি নে? তুমি মিছে আমার সঙ্গে রাগারাগি করছ।

গৃহিণী অভিমানভরে বলিলেন,—আমার কি দরকার কোনো কথা বলে? আমি তো আর কিছু বলব না!

জগৎবাবু বলিলেন,—দেখছি, আমি যে বর ঠিক করে রেখেছি, তা তুমি শুনতে চাও না; যাক্ তা হলে আমি আর কি করব?

বর ঠিক হইয়াছে শুনিয়া গৃহিণী উৎসুক-চিত্তে বলিলেন,—কোথায় বর ঠিক করেছ?

তখন জগৎবাবু বলিলেন,—আমাদের বিনয়কে তোমার কি মনে হয়? ছেলেটি দেখতে শুনতে লেখাপড়ায় কেমন সুন্দর বল দেখি?

বিনয় প্রমোদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসিত এবং গৃহিণীকে মা বলিয়া ডাকিত। গৃহিণীও তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, দুই এক দিন তাহাকে না দেখিলে ব্যস্ত হইতেন, নিজে বসিয়া তাহাকে না খাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু এ সব প্রমোদের বন্ধু হিসাবে;—সে যে কোনো দিন বাড়ীর জামাতা হইতে পারে একথা কখনো তাঁহার মনে আসে নাই। তাঁহার মনে সর্ব্বদা অতুল ঐশ্বর্য্যময় ধন জন পূর্ণ জমীদার-বাড়ীর কুটুম্বিতার সুখময় চিত্র জাগরূক ছিল; স্বামীর কথা শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—বিনয় ছেলে ভাল বটে, তবে নিঃস্ব।

জগৎবাবু বলিলেন,—সে কথা ছেড়ে দাও। তার যদি যোগ্যতা থাকে তা হ'লে পয়সার জন্য ভাবতে হবে না। প্রতিভাবান্ উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী স্বয়ং এসে বরণ করেন। নিজের কথা ভেবে দেখ না—যখন তোমার বিয়ে হয়েছিল তখন কি আমার এমনি অবস্থা ছিল? আমি বিশেষ করে দেখেছি—তার অসাধারণ প্রতিভা, যে দিকেই সে যাবে সে-দিকে কখনো হেরে আসবে না। এই

তো এক সঙ্গে এফ্-এ দিলে, কিন্তু প্রমোদের চেয়ে কত ভাল পাশ হল, দেখ্‌লে তো?

গৃহিণী বলিলেন,—এ কথা কি তাকে বলেছ?

জগৎবাবু বলিলেন,—না এখনো কারুর কাছে বলি নি। সে বি-এ পাশ হোক্ তার পর বল্‌ব। আরো ভেবে দেখ, লাবণ্যর বয়স হয়েছে, সে লেখা-পড়া শিখেছে, আর যে-ভাবে সে এতদিন মানুষ হয়েছে এখন যদি তোমার কথামত স্থানে তার বিয়ে হয়, তা হলে তার পক্ষে সেটা বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। তুমি তার জন্য কিছু ব্যস্ত হইও না, সময় হলেই আমি তার এমন ব্যবস্থা কর্‌ব, যাতে সে কখনো কষ্ট না পায়।

এফ্-এ পাশ হইবার পরেই বিনয়ের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। সে বাড়ী গেলে তাঁহার বিধবা মাতা তাহাকে বিশেষভাবে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ একলা বাড়ীতে আর তাহার মন তিষ্ঠে না। বিনয় এখন বাড়ী আসুক, তাহার বিবাহ দিয়া ঘরকন্না হইলে তবু যা-হোক তাঁহার মনটা একটু সুস্থ হয়। আর চিরকালই কি বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইবে? বিনয় অবশ্য এ-সব কথায় কর্ণপাত করে নাই, তবে এখন তাহাকে কতকটা আর্থিক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তাহার কলেজের ও বাসাখরচের ব্যয় তাহাকে অবসরমত ছেলে পড়াইয়া উপার্জ্জন করিতে হইত, কিন্তু তাহার অসহিষ্ণু চিত্ত এ ব্যবস্থায় দিন-দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। নিজে একটু সময় পায় না—সব সময়টা কেবল পড়া কর আর পড়াও। জগৎবাবুর বাড়ীতেও আর আগের মত যাইবার অবকাশ তাহার থাকিত না।

যেদিন বিনয় পাশের খবর জানিতে পারিল, সেই শুভ সংবাদ দিবার জন্য সেই দিন সন্ধ্যার পর সে জগৎবাবুদের বাড়ীতে গেল। প্রমোদ তখন ঘরে ছিল না। জগৎবাবু ও লাবণ্য বসিয়া তাহাদেরই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। প্রমোদ ও বিনয়ের সফলতার সংবাদে জগৎবাবু অতিশয় সুখী, লাবণ্যও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। বিনয় ঘরে ঢুকিতেই লাবণ্য হর্ষোজ্জ্বলমুখে বলিল,—'আসুন বিনয়বাবু, আমরা এতক্ষণ আপনাদের পাশের কথাই বল্‌ছিলাম। দাদার চেয়ে এবারও আপনারই নম্বর বেশী হয়েছে।'

বিনয় হাসিয়া বলিল,—মনে করেছিলাম আমিই খবরটা প্রথমে দেবো, কিন্তু আপনারা দেখছি আমার আগেই জেনে নিয়েছেন।

জগৎবাবু বলিলেন,—প্রমোদ একটু আগে আমাদের খবর দিয়ে গেল। যা'হোক আমি বড় সুখী হলুম, বিনয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে প্রমোদ হ'তে ভিন্ন ভাবি নে; দিন-দিন তোমার উন্নতি হোক, তুমি সুখী হও, আমারা তাই কামনা করি।

তার পর লাবণ্যকে বলিলেন,—মা বেহারাটা কি করছে দেখ তো, এখনো চা নিয়ে এল না—সন্ধ্যা হয়ে গেছে?

লাবণ্য চলিয়া গেলে জগৎবাবু বলিলেন,—তা হলে এখন কি করবে মনে করেছ বিনয়?

বিনয় এখন কোন্ দিকে যাইবে এবং কি করিবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। সে একটু ভাবিয়া বলিল,—কি কর্‌ব তাই তো ভাবছি। আপনি কি পরামর্শ দেন?

জগৎবাবু বলিলেন,—আমি তোমার বিষয় যা ভেবে রেখেছি, তা বল্‌ছি শুন। এখন তোমার অবস্থা যে-রকম অস্বচ্ছল আমি তা জানি, আমার ইচ্ছে যে লাবণ্যকে তোমার হাতে দিই; তুমি উপস্থিত আমার কাছেই থাক, আর যতদূর তোমার পড়তে হয়, যে লাইনে যেতে ইচ্ছে কর—সব ভার আমিই বহন করব। তার পর যখন তুমি উপযুক্ত হবে, স্বতন্ত্রভাবে থাকার মত সামর্থ্য হবে, তখন তাকে নিয়ে যাবে। তুমি তো এই তিন চার বৎসর তাকে দেখছ, যদি এ বিষয়ে তোমার কোনো